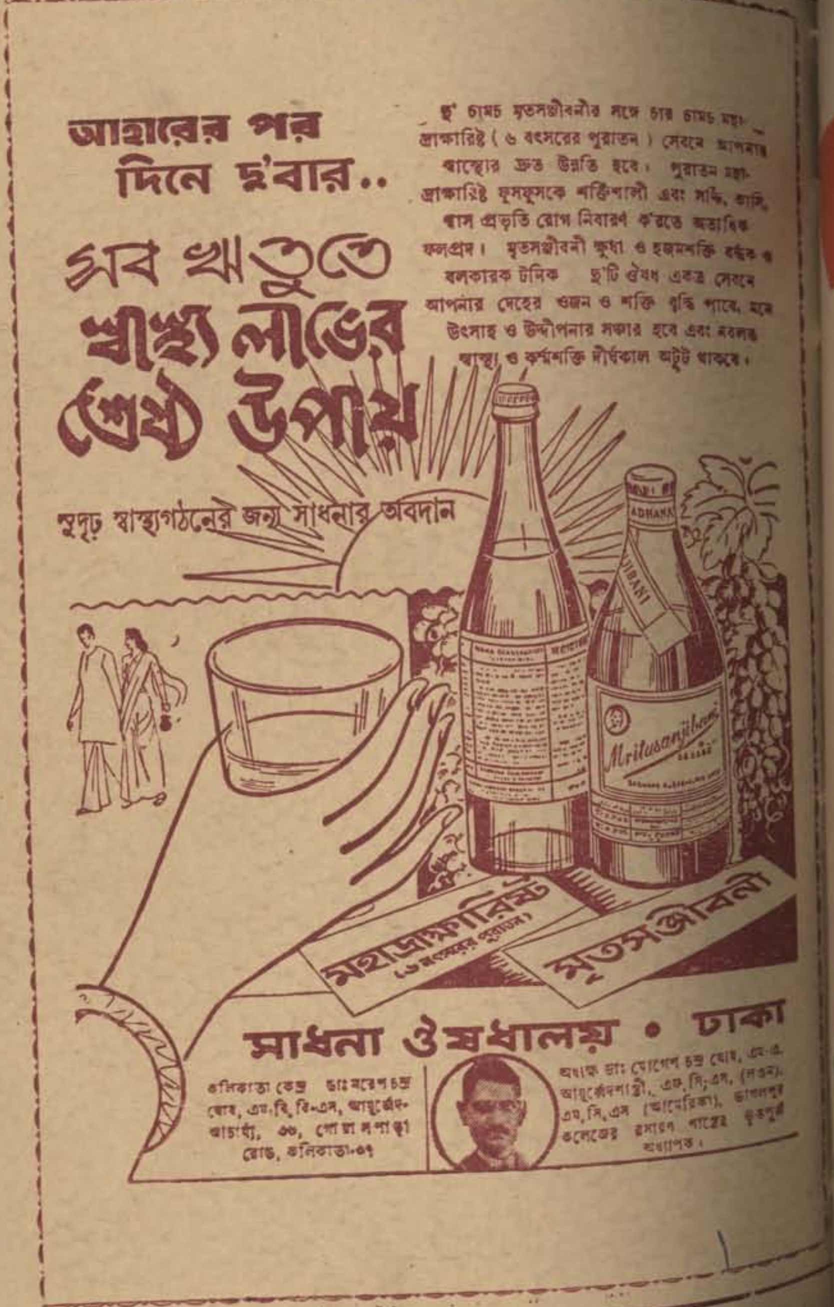
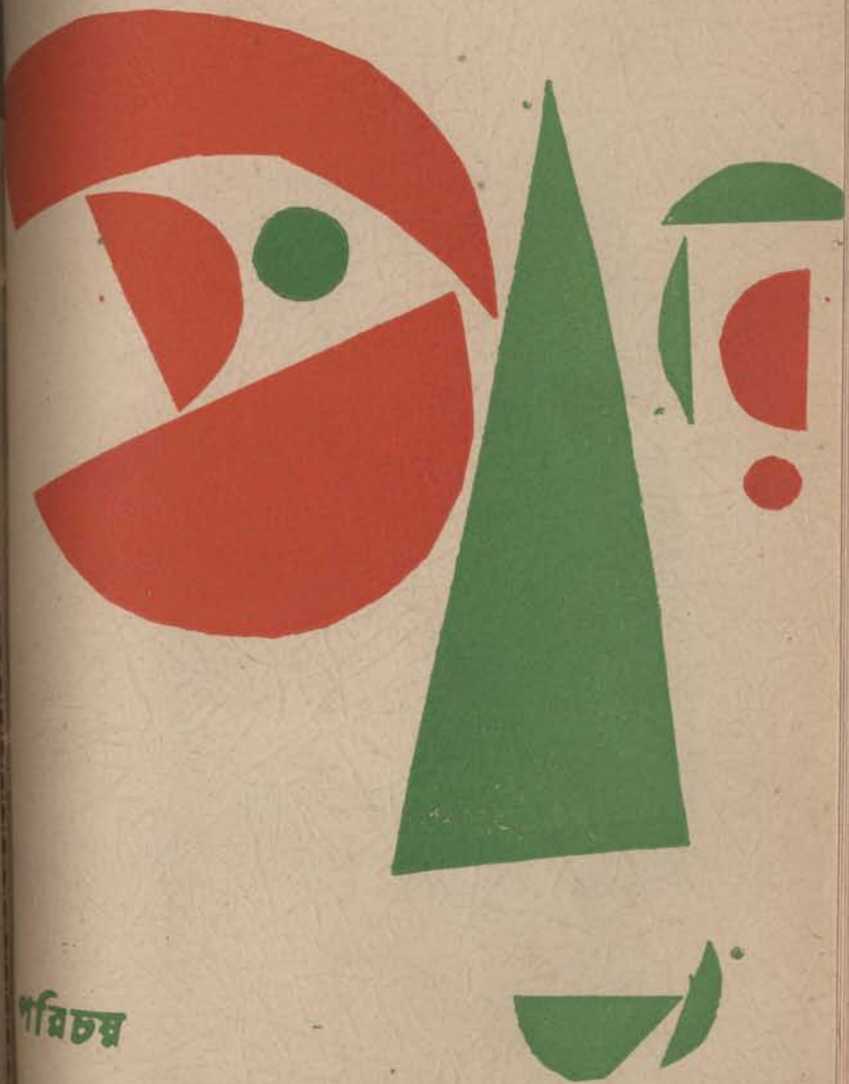


মূল্য : এক টাকা



পরিচয়

পৌষ ১৩৬৯

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



সপুষ্পা — বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন

অংশু দত্ত

এক

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন নামে খ্যাত। ইতিহাসে এ ধরনের আন্দোলনের আরও নজির আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিকাশের জন্য অতীতে প্যান-অ্যামেরিকান ইউনিয়ন গঠিত হয়। সমগ্র জার্মানভাষীদের একরাষ্ট্রে মিলিত করার উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে 'আলডয়চের ফেরবান্দ' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্যান-জার্মান মতবাদ প্রচার করে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গত শতকের শেষদিকে 'প্যান-ইসলাম'-এর শ্লোগান তোলা হয়েছিল। তেমনি শ্লাভ জাতিদের মধ্যে ঐক্যপ্রচেষ্টার লক্ষ্য নিয়ে উনবিংশ শতকে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্যান-শ্লাভনিজম মতবাদের প্রচার হয়।

এইসব আন্দোলনের মূল ভিত্তি ভিন্নধর্মী। প্যান-জার্মান আদর্শের ভিত্তি একভাষা, এক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। প্যান-শ্লাভনিক মতবাদের ভিত্তি অনুরূপ ভাষা, প্রধানত এক ধর্মীয় সংগঠন (পূর্বদেশীয় খৃষ্টধর্ম), অনুরূপ সংস্কৃতি। প্যান-ইসলামীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল এক ধর্ম এবং, ঐস্লামিক সমাজে ধর্মের অনুশাসন সর্বব্যাপী বলে, অংশত এক ধরনের জীবনযাত্রাপদ্ধতি। প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নের অবশ্য ভৌগোলিক বনিয়াদই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামাজিক কাঠামো অনুরূপ: ইওরোপীয়রা অভিজাত, বর্ণসঙ্কর মিশ্র সম্প্রদায় মধ্যস্তরে এবং নিগ্রো ও আদি-আমেরিকানরা সর্বনিম্নে। এর ওপর তাদের রয়েছে একই ধরনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ভিত্তি কী? কয়েক বছর আগে জনৈক মার্কিন পর্যটক দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন থেকে ঘানায় টেলিফোন করতে গিয়ে শুনলেন, লণ্ডন এক্সচেঞ্জের মারফৎ ঘানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পর্যটকের এই ছোট্ট অভিজ্ঞতা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগহীনতার প্রতীক। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের সুযোগের একান্ত অভাব। পূর্ব আফ্রিকা থেকে পশ্চিম আফ্রিকা যাওয়ার কোনো রেলপথ নেই। দুর্গম বিষুবরৈখিক অরণ্য, অনাব্য নদী, দুস্তর মরুভূমি, এ সবই আফ্রিকানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে। ঘানার নাগরিক ও কেনিয়ার নাগরিকের আফ্রিকার যে-কোনো শহরের চেয়ে অনেক সহজে সাক্ষাত হবে লণ্ডনে। ভৌগোলিক বিচ্ছেদ জন্ম দিয়েছে মানসিক বিচ্ছিন্নতার। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের 'ড্রাম' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅ্যাণ্টনী স্যাম্পসন আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তার পত্রিকার পাঠকদের মনোভাব থেকে বলেন, ঘানার অধিবাসীরা জোহানেসবার্গকে এক বিরাট নোংরা বস্তি বলে মনে করে। তারা ভাবতেও পারে না, সে-শহরে আফ্রিকান চিকিৎসক, আফ্রিকান নার্স আছে। তাদের ধারণা, সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে নিরন্তর গৃহযুদ্ধ। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গেরা ভাবে ঘানার নাগরিকেরা আমেরিকানদের মতো ধনী। লাগোস শহরেও জোহানেসবার্গের মতো বস্তি আছে শুনে তারা হতাশ হয়।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাজনিত পারস্পরিক অপরিচয় নিশ্চয় আফ্রিকান ঐক্যের পথে বাধা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য অনেক বিঘ্নও আছে। এই মহাদেশে বহু ভাষা ও বহুতর উপভাষার প্রচলন। আছে বহু ধর্ম (খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ছাড়াও প্রায় প্রতি উপজাতির নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে) ও অসংখ্য উপজাতি। এমন অবস্থায়, সারা আফ্রিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন কী ভাবে সংগঠিত হলো—আর কেমন করেই বা সেই আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে পারল ?

আফ্রিকানদের অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই প্রধানত এই ঐক্যবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে। সারা মহাদেশ প্রথমে ইওরোপীয় বণিকদের শোষণ এবং পরে সাম্রাজ্যবাদের শাসনের শিকার হয়েছে। আমরা জানি, ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যাহ্নে ইথিওপিয়া বাদে আফ্রিকায় অন্য কোনো স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। আর ইথিওপিয়াকে ঠিক খাঁটি নিগ্রো রাষ্ট্র বলাও যায় না।

বহিরাগত ইওরোপীয়দের প্রভুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এবং আফ্রিকানদের উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতায় আস্থা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে, বিশেষত যখন আফ্রিকানরা উপলব্ধি করেছে যে নিজেদের মধ্যে যতোই প্রতিযোগিতা থাক, সামগ্রিকভাবে উপনিবেশিকতা বজায় রাখতে ইওরোপীয়রা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে। পারস্পরিক মেলামেশা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ছিল ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে। অতএব, খুব স্বাভাবিকভাবে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের জন্ম হলো ইওরোপে। অবশ্য গার্ভে-প্রবর্তিত 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের শুরু পশ্চিম গোলার্ধে। কিন্তু, এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে দেখানো হয়েছে, সে-আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান নিগ্রোদের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের যে-ধারা আফ্রিকার নিগ্রোদের সমষ্টিগত চেতনার প্রতীক, তার জন্ম ইওরোপের শহরে শহরে। কিন্তু যেহেতু আফ্রিকার নিগ্রোদের তুলনায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রোরা অনেক পরিমাণে অগ্রসর এবং যেহেতু তারাও বর্ণবৈষম্য ও শোষণের শিকার অতএব স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্কিন ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোরা।

দুই

ত্রিনিদাদের এক নিগ্রো ব্যারিস্টার শ্রীহেনরী সিলভেস্টার-উইলিয়াম্‌স্ সর্বপ্রথম প্যান-আফ্রিকান আদর্শের বাস্তব রূপ দেন। লণ্ডনে পড়তে এসে তিনি পশ্চিম আফ্রিকানদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরে আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি একাধিক আফ্রিকান কৌমপ্রধানকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে (যথা রোডেসিয়া, গোল্ডকোস্ট ইত্যাদি) বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ আফ্রিকানদের জমি ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়। জমি হস্তান্তর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সিলভেস্টার-উইলিয়ামস ১৯০০ সালে লণ্ডনে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের অন্যতম নেতা ... বোয়ার ভাষায়, "এই সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং এই সর্বপ্রথম 'প্যান-আফ্রিকান' কথাটি বিভিন্ন অভিধানে স্থান পেল।" সম্মেলনের প্রতিনিধিরা আসেন প্রধানত ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় থেকে। এবং সম্মেলনের দাবিতে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক শাসনে নেটিভ বা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকটা উপেক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এই আন্দোলন বেশিদিন টিকে থাকেনি। সম্মেলনের কয়েক বছর বাদেই সিলভেস্টার-উইলিয়ামস ওয়েস্ট ইণ্ডিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে জোয়ার আসে। কিন্তু তার স্রোত ছিল দ্বিমুখী : এক ধারার নেতা ছিলেন দ্যু বোয়া, অন্য ধারার মার্কাস অরেলিয়াস গার্ভে। ১৯২০ সালে গার্ভের পরিচালনায় 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুরু হয়। এর মূলকথা ছিল : নিগ্রোরা যেখানেই থাক না কেন, আফ্রিকা হলো তাদের মাতৃভূমি। অতএব, সব নিগ্রোকে আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গার্ভের বর্ণসচেতনতা যেন ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতার উল্টো পিঠ। ইহুদীরা যেমন নিজেদের ঈশ্বর-নির্বাচিত সম্প্রদায় ভাবে, গার্ভে তেমনি ভাবতেন যে নিগ্রোরা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি এবং মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবৎপ্রেরিত। তাঁর নিজের ভাষায়, "সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ যেমন অবিমিশ্র 'শ্বেত' জাতিতে বিশ্বাসী ; আমিও তেমনি অবিমিশ্র কৃষ্ণ জাতিতে বিশ্বাসী।" এই জন্য তাঁর আন্দোলনে বর্ণসঙ্করদের কোনো স্থান ছিল না। 'খাঁটি' নিগ্রোদের নিয়ে গার্ভে সম্মেলন আহ্বান করেন ও পরে নিগ্রো জাতীয় চার্চ, নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গার্ভে 'দি ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাণ্ড আফ্রিকান কম্যুনিটিজ লীগ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়লেন।

১৯২০ সালে নিগ্রো 'রাষ্ট্রে'র প্রথম পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসে নিউ ইয়র্ক শহরে। দূরদূরান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে ৩৩ বছরের যুবক গার্ভেকে আফ্রিকার 'অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি' নির্বাচিত করে। একই সঙ্গে একটি 'ছায়া' মন্ত্রিসভাও নির্বাচিত হয়। এবং যথোচিত রাজকীয় গাম্ভীর্যে গার্ভে তাঁর অনুচরদের কাউকে 'নীল নদীর ডিউক' কাউকে 'কঙ্গোর আর্ল' কাউকে বা 'জাম্বেসির ব্যারন' ইত্যাদি খেতাবে বিভূষিত করলেন। আফ্রিকাকে মুক্ত করার জন্য গঠিত হলো 'সার্বজনীন আফ্রিকান সেনাদল'। অর্থ? প্রথম প্রথম তার অভাব হয় না। আমেরিকা, ইওরোপ ও আফ্রিকার নিগ্রোরা বহু দান-খয়রাত করেন।

'আফ্রিকার যুবরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত বৃটিশ হন্ডুরাসের এক নিগ্রো ধনী স্যর ইসাইয়া ইমান্যুয়েল মর্টার তো একাই ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন। নিগ্রো রাজ্যের আদর্শ প্রচারের জন্য গার্ভে ইংরাজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় 'নিগ্রো জগৎ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ১৯২৩ সালে সংগঠনের নেতারা দাবি করেন যে তাঁদের সভ্যসংখ্যা ৬০ লক্ষ।

'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুধু কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। লাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোদাসদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা আমেরিকান নিগ্রোরা ভোলেনি। গার্ভে ও তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা দাবি করলেন : "শ্বেত-আমেরিকানরা আফ্রো-আমেরিকানদের লাইবেরিয়ায় যেতে ও তাকে উন্নত করতে সাহায্য যোগাক। তারপর রয়েছে জার্মানির আফ্রিকান উপনিবেশ-সমূহ। আমেরিকান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোরা মিত্রপক্ষের হয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছে। অতএব, তাদের হাতে এই সব দেশগুলি তুলে দিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে বাধ্য করা হোক। তার ওপর, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডের কাছে আমেরিকা কোটি কোটি টাকা পায়। ঋণশোধে এরা অপারগ হওয়ায়, বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন ও ফরাসী উপনিবেশ আইভরী কোস্ট লাইবেরিয়ার হাতে তুলে দিয়ে, লাইবেরিয়াকে তার ইতিহাসের যোগ্য দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করুক।"

গার্ভের লাইবেরিয়ায় বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু রাজনীতিক নেতার সমর্থন পায়। আমেরিকার সরকারী সমর্থনের আশায় গার্ভে লাইবেরিয়ায় এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আফ্রো-আমেরিকানদের বসতি স্থাপনের জন্য লাইবেরীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি পাওয়া। লাইবেরিয়া-শাসকদের অধিকাংশ হচ্ছেন মুক্তিপ্রাপ্ত আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসদের বংশধর। অতএব গার্ভের প্রস্তাব তাঁদের সমর্থন পেল।

১৯২৪ সালে গার্ভে প্রেরিত দ্বিতীয় এক প্রতিনিধিদল ও লাইবেরীয় সরকার যথাবিহিত আলোচনান্তে স্থির করলেন : (১) প্রথম দুই বছরে বিশ থেকে তিরিশ হাজারের মতো নিগ্রো পরিবার লাইবেরিয়ায় যাবে ; (২) লাইবেরীয় সরকার বিনামূল্যে হাজার হাজার একর জমি এদের বিলি করবেন ; (৩) নবাগত নিগ্রোরা লাইবেরীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করার শপথ নেবে ; (৪) গার্ভের সংগঠন, 'দি ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন'

বা ইউ. এন. আই. এ., এই পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা খরচ করবে।

পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য সাধারণ্যে আবেদন জানানো হলে প্রকৃত সাড়া পাওয়া যায়। বহু অর্থব্যয়ে ইউ. এন. আই. এ. নয়া উপনিবেশিকদের জন্য হাসপাতাল, টাউন হল, আদালত, ডাকঘর, পুলিশ-ঘাঁটি, সিনেমা হল, পাঠাগার, বিদ্যালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে।

যখন এইসব আয়োজন সমাপ্তির পথে, তখন হঠাৎ লাইবেরীয় সরকার প্রতিশ্রুত কনসেশন প্রত্যাহার করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যেসব মালমশলা লাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে-সব বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়। লাইবেরীয় সরকারী মহলের সন্দেহ ছিল, লাইবেরিয়ার সরকারকে উচ্ছেদ করে সে-দেশের ক্ষমতা দখলই হচ্ছে গার্ভে ও তাঁর দলবলের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া হয়তো লাইবেরিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির শাসক, বৃটেন ও ফ্রান্স, লাইবেরীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তাদের উপনিবেশের এত কাছে এমন সংগ্রামাত্মক আন্দোলন সহ্য করা হবে না। কারণ যা-ই হোক না কেন, 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের আকস্মিক অপমৃত্যুতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

লাইবেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার বুদ্বুদ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া, গার্ভে-আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ব্ল্যাক স্টার লাইনের দেউলিয়ায়। অবস্থা চরমে ওঠে যখন ১৯২৫ সালে প্রবঞ্চনার অপরাধে গার্ভে মার্কিন সরকার কর্তৃক পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এরপর আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে এবং ভগ্নহৃদয় ভবিষ্যৎ 'আফ্রিকা-রাজ্যের রাষ্ট্রপতি' গার্ভে ১৯৪০ সালে প্রায়বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

গার্ভে নিজকে নিগ্রোজাতির মোসেস বলতেন। মোসেস-পরিচালিত ইহুদীদের সঙ্গে অবশ্য গার্ভে-পরিচালিত আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'প্রবাসী' নিগ্রোদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে ইহুদীরা গোলামের মতো দিন কাটাত। আফ্রিকা থেকে বলপ্রয়োগে নিগ্রোদের আমেরিকায় এনে সেখানে তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়েছিল। ইহুদীদের জেরুসালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মোসেস। আমেরিকান নিগ্রোদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল গার্ভের।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা যে অনেকাংশে অবাস্তব তাতে সন্দেহ নেই। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর সমগ্র নিগ্রো অধিবাসীদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম নয়। প্রথমত, কয়েকপুরুষ আমেরিকা-বাসের ফলে উন্নততর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমেরিকান নিগ্রোদের সকলেই যে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে ফিরতে চাইত, তা মনে হয় না। আর তারা চাইলেও তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের জায়গা কোথায়? ১৯২০ সালে আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। আর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে গার্ভে-অনুগামীদের বসবাস করতে দেবে এমন কথা ভাবা অলীক স্বপ্ন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা-নির্বাচন, উপাধি বিতরণ ও সৈন্যদল গঠন সত্ত্বেও গার্ভের আশা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। মহাশূন্যে তো আর রাষ্ট্র গঠন করা যায় না।

তিন

গার্ভের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অন্য ধারার নেতা দ্যু বোয়া 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের মূল্যবিচার প্রসঙ্গে বলেন, "সামগ্রিকভাবে বাস্তবে রূপায়ণ অসম্ভব হলেও এই আন্দোলন ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ। তবু এর নিষ্ঠা ও ব্যবহারিক দিকটির কথাও বলা দরকার। গার্ভে প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতাই নন, প্রচার-অভিযানেও তাঁর নিপুণ পারদর্শিতা। তাঁর নির্ভীক প্রচার ও সংগঠনের মারফৎ গার্ভে সারা দুনিয়ার নিগ্রোদের এক নতুন প্রেরণা ও স্বাজাত্যাভিমান এনে দিয়েছেন। অন্য সব কিছু ভুলে গেলেও, এ অবদান কিছু কম নয়।"

বস্তুত, গার্ভে ছিলেন উপপ্লাবক জননেতা। জন-মনস্তত্ত্ব তিনি ভালো বুঝতেন; কেমন করে বিক্ষোভ জাগাতে হয়, কি-ভাবে সাহস ও বিশ্বাস দিতে হয়, এসব ছিল তাঁর নখদর্পণে। পক্ষান্তরে দ্যু বোয়া ছিলেন মননশীল অধ্যাপক। গার্ভে যেখানে আবেদন করতেন হৃদয়বৃত্তির কাছে, সেখানে দ্যু বোয়ার আবেদন যেত বুদ্ধিবৃত্তিতে। গার্ভে ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতা ও জাতিগর্বকে আঘাত করতে চাইতেন কৃষ্ণবর্ণগর্ব দিয়ে। আর দ্যু বোয়া ছিলেন সব রকমের জাতি-আভিজাত্য-গর্বের শত্রু। তাঁর নিজের অজস্র রচনা ও বক্তৃতায় দ্যু বোয়া 'শ্বেত' জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

গার্ভের অনেক আগে তিনি প্রচার ও আন্দোলনে নেমেছেন। এবং গার্ভে যখন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি জ্যামেইকা ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, দ্যু বোয়া ততোদিনে আমেরিকান নিগ্রোদের কিছু অংশকে সংগঠিত করতে পেরেছেন।

যাই হোক, প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের দুর্ভাগ্যবশত দ্যু বোয়া ও গার্ভে একসঙ্গে কাজ করতে পারেন নি। তার একটা কারণ আমরা আগেই বলেছি, দ্যু বোয়া গার্ভের মতো বর্ণাভিজাত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় এক কারণ, উভয়ের লক্ষ্য ও আদর্শগত পার্থক্য। দ্যু বোয়ার লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। বর্ণসমস্যাকে তিনি ধনতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। গার্ভে কিন্তু ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজমের প্রকাশ্য সমর্থন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়: "পৃথিবীর প্রগতির জন্য ধনতন্ত্রের প্রয়োজন আছে। যারা এর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক ও যথেচ্ছাক্রমে বাধা দেয়, তারা মানবিক প্রগতির শত্রু।" গার্ভের আক্ষেপ শুধু ছিল, "আফ্রিকা কেন পৃথিবীকে কৃষ্ণাঙ্গ রকফেলার, রথস্‌চাইল্ড ও হেনরি ফোর্ড উপহার দেবে না?" অন্যদিকে নব্বুই বছরের বৃদ্ধ দ্যু বোয়া ১৯৫৮ সালে ঘানায় অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান সম্মেলনে বাণী পাঠান: "বেসরকারী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বেসরকারী ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে।… যে আফ্রিকান কৌম থেকে আপনাদের সকলের জন্ম, সেই আফ্রিকান কৌমসমাজ প্রথম থেকেই ছিল সাম্যাত্মক…পশ্চিমী পুঁজিবাদীদের ভিক্ষান্নের জন্য নিজেদের মহান ঐতিহ্য বিক্রয় করার চেয়ে বরং আপনাদের আর কিছুদিন উপবাসে থাকা শ্রেয়ঃ।… আফ্রিকা জাগো।" আর এই ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই তিরানব্বুই বছরের নেতা দ্যু বোয়া প্রকাশ্যে ও সগর্বে আমেরিকান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন।

কার্যক্রমের দিক থেকেও দ্যু বোয়ার আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বহমান। 'আফ্রিকায় ফিরে চল'-এর ডাকে তিনি ভোলেন নি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, আফ্রিকামহাদেশের বিভিন্ন জনমুক্তি সংগ্রামে সকলের সমবেত সাহায্য দান। এই উদ্দেশ্যে দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে পাঁচটি প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে পারী শহরে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে মোট সাতান্ন জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলন থেকে যে-সব দাবি তোলা হয় তার মধ্যে এইগুলি ছিল প্রধান:

(১) আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশগুলিতে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে অছি শাসন প্রবর্তিত হোক (পরবর্তীকালে লীগ অফ নেশন্সের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা)।

(২) আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য মিত্রশক্তিরা কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণ করুক।

(৩) লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক এই নীতিগুলির বাস্তবে রূপায়ণ তত্ত্বাবধানের জন্য এক স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হোক।

প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে প্রস্তাবিত ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক গৃহীত হয়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে কংগ্রেস আফ্রিকার সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশেষ করে ভার্সাই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ইভনিং গ্লোব পত্রিকার পারীস্থ প্রতিনিধি লেখেন, "ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম।" ১৯১৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা মন্তব্য করে, "প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস রচিত কর্মসূচীতে অযৌক্তিক কিছু নেই।"

প্রথম কংগ্রেসের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্যু বোয়া ও তাঁর বন্ধুরা ১৯২১ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেস আয়োজন করলেন। এবার মোট ১১৩ জন প্রতিনিধি যোগ দেন, তার মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খোদ আফ্রিকা থেকে। লণ্ডন, ব্রাসেলস ও পারী শহরে এর অধিবেশন বসে এবং স্থানীয় সমাজতন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেকে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেস থেকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি ওঠে এবং দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লীগ অফ নেশন্সের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের আবেদনপত্রটি লীগের 'সরকারী দলিল' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রায় একই সময়ে পারী শহরে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের একটি স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনেরও প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু কয়েক বছর কাজ করার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি লণ্ডন ও লিসবোয়ায় (লিসবনে) তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। লণ্ডনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হারল্ড ল্যাস্কি, যোগদান করেন এইচ. জি. ওয়েলস এবং বাণী পাঠান ভাবী প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

[ক] স্বদেশশাসনে ঔপনিবেশিক জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার ;

[খ] সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ;

[গ] আফ্রিকাবাসীর স্বার্থে আফ্রিকার উন্নয়ন ;

[ঘ] বিশ্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বেআইনী ঘোষণা ; কিন্তু যদি এই লক্ষ্য বাস্তবে প্রয়োগ না করা যায়, তবে যতোদিন শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, ততোদিন কৃষ্ণাঙ্গদের আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অধিকার।

কংগ্রেসের লিসবোয়া অধিবেশনে পর্তুগালের দু'জন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী বক্তৃতা করেন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশে 'চুক্তিবদ্ধ শ্রম' ব্যবস্থার (যাকে প্রায় দাসত্ব বলা যায়) বিলোপ সাধনে সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখনীয়, আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশে আজ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শ্রমদানের নিয়ম প্রচলিত আছে।

দ্যু বোয়া চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের আয়োজন করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, একটি জাহাজ ভাড়া করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচার-পর্যটন চালাবেন। এবং তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর কোনো এক শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ কোম্পানীগুলির সহানুভূতির অভাবে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। সেই বছরে নিউ ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

দ্যু বোয়া লিখেছেন : "আফ্রিকা মহাদেশে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯২৯ সালে আমরা অনেক চেষ্টা করি। যাতায়াত সহজ বলে টিউনিস শহরটি নির্বাচন করা হয়।···কিন্তু দু-টি দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হলো। প্রথমত, ফরাসী সরকার খুব ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে আমাদের জানালেন, সম্মেলন ফ্রান্সের যে-কোনো শহরে অনুষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু ফরাসী আফ্রিকায় নয়। আর দ্বিতীয় বাধা আসে : পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট।" অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হতে না হতে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে এল। তাই, পঞ্চম আফ্রিকান কংগ্রেস ১৯৪৫ সালের আগে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

অবশ্য ইতিমধ্যে আফ্রিকার ঐক্যাকাঙ্ক্ষী নেতারা যে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তা নয়। ১৯৩৬ সালে ইতালীর ইথিওপিয়া আক্রমণে 'ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ফ্রেণ্ডস অফ আবিসিনিয়া' নামে একটি সংস্থার জন্ম হলো, যার

উদ্দেশ্য ছিল ইথিওপিয়ার স্বাধীনতারক্ষা। এই সংস্থার কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্য অন্য কয়েকজন উৎসাহী লোকের সাহায্যে ১৯৩৭ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো' স্থাপন করেন। নামে আফ্রিকান হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি অনাফ্রিকান জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সমর্থন জানায়। অনাফ্রিকানদের এতে 'সংশ্লিষ্ট' সদস্যপদ (অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ) লাভের অধিকারও দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিত হয়। শেষোক্ত সংগঠনে ইতিপূর্বেই বৃটেন ও বৃটিশ আফ্রিকার নানা সংস্থা সম্মিলিত হয়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিষ্ঠানিক ঐক্যের পর, সংগঠন ও আদর্শ উভয় দিক থেকেই প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশন প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস আন্দোলনের বৃটিশ শাখার স্থান গ্রহণ করে।

১৯৪৫ সালে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। গোল্ডকোস্টের প্রতিনিধি ছিলেন ন্‌ক্রুমা, কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করলেন জোমো কেনিয়াট্টা, আর সিয়েরা লিওন থেকে অসেন ওয়ালেস জনসন। আফ্রিকার জনগণের (বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার) স্বাধীনতার দাবি সমর্থন ছাড়া, সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় এবং রোডেসিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের ওপর জোর করে যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টার নিন্দা করে। সম্মেলন শেষে কংগ্রেস আটলান্টিক সনদের নীতিগুলি মেনে চলার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিদের আহ্বান জানায়।

পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কাজে প্রয়োগের ভার পড়ে প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের ওপর। এ ছাড়া কোয়ামে ন্‌ক্রুমা নিজ উদ্যোগে একটি পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েট গঠন করলেন, যার লক্ষ্য ছিল পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়ণ। পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েট ও পশ্চিম আফ্রিকান ছাত্র সংঘের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে লণ্ডন শহরে এক সম্মেলন আহূত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে প্যান-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রস্তুতি হিসাবে পশ্চিম আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শপথ গ্রহণ করলেন।

এই সম্মেলনের এক বছর পরে পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় সেক্রেটারিয়েটের সম্পাদক কোয়ামে নক্রুমা গোল্ডকোস্টে ফিরে সেখানকার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারও দশ বছর বাদে গোল্ডকোস্ট স্বাধীনতা পায়। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এতগুলি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু হয়েছে।

এই নব পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কী দেখা যাক।

চার

এতদিন প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছিল। আফ্রিকা মহাদেশে সংগঠন করা তো দূরের কথা, এর পাঁচটি কংগ্রেসের একটিও আফ্রিকার বুকে মিলিত হতে পারেনি। আফ্রিকার এতগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হবার পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন তার বাণী সোজাসুজি লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর কাছে পৌছে দেবার সুযোগ পেয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের অর্থ-সমস্যাও মিটেছে। অর্থাভাবে কোনো আফ্রিকান ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না, একথা আজ চিন্তাতীত।

পক্ষান্তরে সারা দুনিয়াব্যাপী ঐক্যবদ্ধ নিগ্রো ফ্রন্ট গঠনের প্রেরণাও বুঝি আর তেমন শক্তিশালী নেই। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অধিবাসীদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হয়েছে। ওয়েস্টইণ্ডিজে নিগ্রোরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের পথে এগিয়ে গেছে। সর্বোপরি আফ্রিকার বহু উপনিবেশ শুধু স্বাধীনতাই পায়নি, তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এমন কি শত্রুতা পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। ইথিওপিয়া-সোমালিয়া ও ঘানা-টোগো সীমান্ত নিয়ে মনোমালিন্য, মরক্কো ও মরিতানিয়ার বিবাদ, ঘানা ও নাইজেরিয়ার প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমে বলেছি, প্যান-জার্মান আন্দোলনের ভিত্তি এক ভাষা ও সংস্কৃতি, প্যান-ঐস্লামিক আন্দোলনের বনিয়াদ এক ধর্ম আর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নির্ভর-স্তম্ভ হলো অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। পরাধীন, শোষিত ও ঘৃণিত নিগ্রোদের সমস্বাতন্ত্র্যচেতনা স্বাভাবিক কারণেই জাগে। কিন্তু আজ যখন আফ্রিকানরা স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় নিজেদের সম্মানজনক স্থান আদায় করে নিতে পারছে,

তখন তাদের মধ্যে প্যান-আফ্রিকান মনোভাব দুর্বল হয়ে ভাষা, ধর্ম, সমাজাদর্শ ও কৌম অনুযায়ী বিভেদ জাগাটা খুব অভাবিত বলা যায় না।

তাই সমস্ত আফ্রিকান রাষ্ট্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের চেষ্টা এখনও সফল হয় নি, বা অদূর ভবিষ্যতেও তার সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, অথচ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের সাধারণ মতামত জোরের সঙ্গে বলার জন্য ঐক্যের প্রয়োজন আছে, একথা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অস্বীকৃত নয়। এবং এই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন এবং অন্য যা কিছু ব্যবস্থা-অবলম্বন প্রয়োজন, তা তারা করে। গত পাঁচ বছরে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে আফ্রিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম আটটি স্বাধীন দেশ (ইথিওপিয়া, ঘানা, টিউনিসিয়া, মরক্কো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সুদান) পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারের জন্য আক্রায় মিলিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে এইগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য : (ক) আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় নির্দিষ্ট করে ঘোষণার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রতি আহ্বান; (খ) আলজেরিয়ার জনমুক্তি সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন; (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

পরের বছর আগস্ট মাসে ন-টি আফ্রিকান রাষ্ট্র আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ ও 'অন্যান্য সাধারণ সমস্যা' আলোচনার জন্য লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ায় মিলিত হয়। এর প্রকাশ্য অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে কায়রোস্থিত 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'-এর প্রেরিত দূতদের পূর্ণক্ষমতাসহ সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সম্মেলনে গিনি প্রজাতন্ত্রের নেতা শ্রীসেকু তুরে গিনি কর্তৃক 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'কে স্বীকার এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সম্মেলনে আলজেরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবে ফ্রান্সকে যুদ্ধ বন্ধ করে 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রদের ফ্রান্সকে উক্ত সংগঠন-প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র আলজেরিয়ায় ব্যবহার থেকে বিরত করতে আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া, স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের 'আলজেরীয় সাময়িক সরকার'কে বৈষয়িক সাহায্যের অনুরোধও সম্মেলন করে।

নক্রুমার আহ্বানে আক্রায় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে 'নিশ্চয়াত্মক

কার্যক্রম' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য, আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলন দমন ও সাহারায় ফ্রান্সের পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে 'নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম' গ্রহণ করা। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নীচেরগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে কমনওয়েলথ থেকে বিতাড়ন, তার পণ্য বয়কট ও তার কাছ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট প্রত্যাহার; (২) ফরাসী পণ্য বর্জন ও স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে ফরাসী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ; এবং (৩) আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন।

এর ছু-মাস বাদে দশটি আফ্রিকান রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় মিলিত হয়। এ ছাড়া কিছুকালের মধ্যেই স্বাধীনতা পাবে এমন ছু-টি দেশ (নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া) ভোটাধিকার ছাড়া আলাপ-আলোচনায় যোগ দেয়। এখানে আফ্রিকান ঐক্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পরও এর যথার্থ রূপ এবং সঙ্ঘবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত সময় নিয়ে মতৈক্যে পৌছান যায় নি। ঘানার পররাষ্ট্রসচিব বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্যে'র প্রয়োজন সমর্থনান্তে উল্লেখ করেন যে ঘানার নতুন সংবিধানে আফ্রিকান ঐক্যের স্বার্থে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, আফ্রিকান রাষ্ট্র ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব তিনি পেশ করেন। এর উত্তরে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্র ইউনিয়ন গঠনের উপযুক্ত মুহূর্ত এখনও উপস্থিত হয়নি। ট্যাঙ্গানাইকা নেতা জুলিয়াস নিয়েরেরে ট্যাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডার মিলনে এক পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান। মতবিনিময়ের শেষে সম্মেলন একটি যৌথ আফ্রিকান বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, একটি যৌথ আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, আফ্রিকান অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এর পর ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন। এখানে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ছিল: মরক্কো, ঘানা, মালি, গিনি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও লিবিয়া। টিউনিসিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া ও টোগো উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণে অনিচ্ছা জানায়। সম্মেলন থেকে কঙ্গোর

নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার প্রতি সাধারণভাবে সমর্থন জানানো হয়। এ ছাড়া অন্য একটি প্রস্তাব মারফৎ মরিতানিয়াকে ফ্রান্সের 'উপগ্রহ রাজ্য' আখ্যা দিয়ে সে-দেশের ওপর মরক্কোর দাবি সমর্থিত হয়। সম্মেলন থেকে একটি 'আফ্রিকান চার্টার' গৃহীত হয়, যদিও লিবিয়া ও অন্তর্বর্তী আলজেরীয় সরকারের প্রতিনিধিরা এই সনদে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। সম্মেলনের শেষে ঘোষিত হলো, "যত শীঘ্র সম্ভব একটি আফ্রিকান উপদেষ্টা পরিষদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান সমবায়ে এক রাজনৈতিক কমিটি এবং বিভিন্ন দেশের সেনাপতিদের নিয়ে এক আফ্রিকান হাইকম্যাণ্ড গঠিত হবে।"

আলাপ-আলোচনার মারফৎ পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থাবলম্বন শুধু রাষ্ট্রনেতাদের সম্মেলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও জনসংগঠন-গুলির সোৎসাহ শক্তি এই কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষে ৫০টি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি আক্রায় মিলিত হয়। মোট ২৫টি আফ্রিকান দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে কেনিয়ার শ্রমিক নেতা টম এম্বোয়া সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনের একটি কমিটি প্রস্তাব করে যে, প্রথমত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর সারা আফ্রিকা জুড়ে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্মেলন থেকে আক্রায় একটি স্থায়ী দফতর স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

এর পর ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বয়কট ও আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যদান বিষয়ে আলোচনা চলে। তৃতীয় সম্মেলন আহূত হয় কায়রো শহরে (মার্চ, ১৯৬১)। সম্মেলন আলজেরীয় সরকারকে সর্বাত্মক সমর্থন জানায় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাহারা আলজেরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করে। এ ছাড়া গিজেঙ্গা-পরিচালিত স্টানলেভিল সরকারের প্রতিও আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। অন্য এক প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করার জন্য সম্মেলন আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানায়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐক্যের আগ্রহ শুধু মাঝে মাঝে সম্মেলন অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। চেষ্টা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তা গঠনের।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত এই স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি। বরং প্যান-আফ্রিকানিস্টরা গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অন্যদিকে ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তির প্রস্তাব আজও প্রকৃতপক্ষে কাগজে-কলমে বন্দী হয়ে আছে বলা যায়।

প্রথমে মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। দ্য গলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের পর একদিকে যেমন ফ্রান্সের চাপিয়ে দেওয়া বৃহত্তর রাজ্য ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ভেঙে গিয়ে আটটি পৃথক দেশে (মরিতানিয়া, গিনি, সেনেগাল, সুদান, আইভরী কোস্ট, উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে) পরিণত হলো, অন্যদিকে তেমনি স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনেরও সুযোগ এল। এর প্রথম প্রকাশ: সেনেগাল, সুদান (ভূতপূর্ব ফরাসী সুদান), উর্ধ্ব ভলতা ও দাহোনে'র মালি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন প্রচেষ্টায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। এই সিদ্ধান্তের পর এক যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে মালি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে, যার আদর্শ ছিল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান।

আনুষ্ঠানিকভাবে মালি যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। তার মধ্যে কিন্তু উর্ধ্ব ভলতা ও দাহোমে পশ্চাদপসরণ করেছে। অর্থাৎ মালি যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হলো মাত্র দু-টি দেশ নিয়ে সুদান (পূর্বতন ফরাসী সুদান) ও সেনেগাল। সেপ্টেম্বর মাসে মালি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে শিথিল বন্ধন বজায় রেখে স্বাধীনতা চায়। পরের বছর (১৯৬০) এপ্রিল মাসে ফ্রাঙ্কো-মালি চুক্তিতে মালির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার পর জুন মাসে মালি পূর্ণ স্বাধীন দেশে পরিণত হলো। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর মালি যুক্তরাষ্ট্র দু-মাসেরও বেশি টেকেনি। আগস্ট মাসের শেষার্ধে সুদানী ও সেনেগালী নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সেনেগালী নেতাদের মতে সুদানী নেতারা (বিশেষ করে মোদিবো কেইতা) অন্যায়ভাবে নিজেদের প্রভুত্ববিস্তারে ব্যাপৃত। সঙ্কট চরমে ওঠে যখন কেইতা (যিনি ছিলেন সুদান ও মালি যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের প্রধান মন্ত্রী) সেনেগালী নেতাদের পদচ্যুত করলেন। উত্তরে সেনেগালী আইনপরিষদ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে সেনেগালের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এবং কেইতা ও অন্যান্য সুদানী নেতাদের কিছুকাল স্বগৃহে অন্তরীণ রাখার পর তাঁদের মুক্তি দিয়ে সুদানের রাজধানী

বামাকো শহরে পাঠানো হয়। সুদানের নেতারা অভিযোগ করেন, সুদান-সেনেগাল সংঘর্ষের মূল প্ররোচক মালিস্থ উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারীবৃন্দ। সঙ্গে সঙ্গে এমন দাবিও ওঠে যে সংবিধানতঃ মালি যুক্তরাষ্ট্র এরকমভাবে ভেঙে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের শেষদিকে সুদানী আইনপরিষদও মালিযুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা মেনে নেয়।

মালি যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা, তার বাস্তবে রূপায়ণ ও তার পতন সবই কিছুটা আকস্মিক। এর তুলনায় ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তির প্রগতি অতি বিলম্বিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতই বিলম্বিত যে সংযুক্তি-প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়ণ এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি বললেই চলে। ১৯৫৯ সালের মে মাসে নক্রুমা ও সেকু তুরে এক যুক্ত বিবৃতিতে দুই দেশের মিলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়নের পরিকল্পনাও প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনানুসারে আফ্রিকান রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রতিটি সদস্য-দেশের নিজ স্বাতন্ত্র্য, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও পৃথক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকার স্বীকৃত থাকবে। সমগ্র রাষ্ট্রসঙ্ঘ মিলিতভাবে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যদিও প্রতি রাষ্ট্রের পৃথক সেনাদল থাকবে। এ ছাড়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থাপিত হবে এক সাধারণ অর্থ নৈতিক পরিষদ এবং নোট-মুদ্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অধিবাসীরা পাবে দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকার ; তাদের নিজ নিজ দেশের এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের।

জুলাই মাসে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো নক্রুমা, তুরে এবং লাইবেরিয়ার টাউবম্যান স্থির করেন যে ১৯৬০ সালে আফ্রিকার সমগ্র স্বাধীন রাজ্যকে এক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করে আরও সুষ্ঠুভাবে ঐক্যবদ্ধ আফ্রিকান সমাজ গঠনের চেষ্টা হবে।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা মালি প্রজাতন্ত্রের মোদিবো কেইতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ঘোষণা করেন যে ঘানা ও মালি এক আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সব কথা খুলে না বললেও নক্রুমা একথা প্রকাশ করেন যে কেইতার সঙ্গে তিনি ঘানা-মালি ঐক্যবন্ধন বিষয়ে আরো কতকগুলি ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

পরের মাসের শেষে (ডিসেম্বর, ১৯৬০) নক্রুমা, কেইতা ও সেকুতুরে এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘানা, গিনি ও মালির সমন্বয়ে এক ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তের কথা বলেন। এই ইউনিয়নের থাকবে সাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক

ও অর্থনৈতিক নীতি। ইউনিয়ন গঠন ও সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বনের উপায় নির্ধারণের জন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এ ছাড়া ঠিক হলো যে এ তিন দেশের রাষ্ট্রপতিরা বছরে চারবার করে মিলিত হবেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা ছাড়া ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্তি প্রস্তাব খুব বেশি দূর এগিয়েছে বলা যায় না।

আফ্রিকার রাজনীতিতে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বামপন্থী কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা পশ্চিমী নেতৃত্ব সরাসরি মেনে নিতে অনিচ্ছুক তাঁদের ঐক্যপ্রচেষ্টার কথা এতক্ষণ বলা হলো। এঁরা ছাড়া পাশ্চাত্ত্যপন্থী রাষ্ট্রনায়করাও নিজেদের ঐক্য গড়ার কাজে নেমেছেন। মালি যুক্তরাষ্ট্র উদ্বোধনের কিছুদিন বাদে আইভরী কোস্ট, উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে মিলে 'সাহেল-বেনিন' ইউনিয়ন গঠন করে। এই চারটি দেশ, বিশেষ করে প্রথম দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রয়েছে। জনসংখ্যার চাপের ফলে ভলতার বহু নাগরিককে আইভরী কোস্টে গিয়ে জীবিকার্জন করতে হয়। ভলতার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের গতিপথ হলো আইভরী কোস্টের আবিদিয়ান বন্দরের মধ্য দিয়ে। অতএব, এইসব রাষ্ট্রের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আইভরী কোস্টের রাজধানী আবিদিয়ানে ১৯৫৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে এই চারটি দেশের নেতৃবৃন্দ সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন গঠনের জন্য কয়েকটি বিধানের কথা ঘোষণা করেন :

(ক) উল্লিখিত চারটি দেশ নিয়ে এক শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ;

(খ) অর্থ, বিচারব্যবস্থা, শ্রম, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য ও করব্যবস্থা সম্পর্কে এই সব দেশের আইনসমূহের সামঞ্জস্য বিধান ;

(গ) পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সংহতি-তহবিল স্থাপন ; এবং

(ঘ) ইউনিয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক 'কঁসেই দ্য লঁতাং' ; (মৈত্রী পরিষদ) গঠন।

সাহেল-বেনিন ইউনিয়নের হোতা ছিলেন আইভরী কোস্টের বিখ্যাত নেতা হুফুয়ে বোয়াঞি। মালি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পরিবর্তে যে তিনি অন্য এক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? প্রথমত মৌলিক আদর্শের দিক থেকে মালির প্রধান সমর্থক সুদানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

হুফুয়ে-র অনেক প্রভেদ, কারণ এঁদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী। এ ছাড়া, ফরাসী 'কম্যুনিতে'র সঙ্গে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, সে-বিষয়েও মালির নেতাদের সঙ্গে হুফুয়ে বোয়াঞি একমত হতে পারেন নি। যেখানে মালি যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা ফরাসী 'কম্যুনিতে'কে কমনওয়েলথের আদর্শে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, সেখানে ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করাই হুফুয়ে-র অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু মালি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই 'কঁসেই দ্য লঁতাং'-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি (উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার, আইভরী কোস্ট ও দাহোমে) ফ্রান্সের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। আগস্ট মাসে এই চারটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, যদিও স্বাধীনতা পাবার পরেও গিনি, মালি প্রভৃতি দেশের তুলনায় এদের মধ্যে ফরাসী প্রভাব অনেক বেশি মাত্রায় বজায় থাকে।

পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ কর্তৃক মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পরে পূর্বতন ফরাসী-বিষুবরৈখিক আফ্রিকার চারটি দেশ,—মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ইয়ুবাঁগুই-শারি) কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (পূর্বেকার ফ্রান্স শাসিত মোয়াইয়েন বা মধ্য কঙ্গো), গাবোঁ প্রজাতন্ত্র ও শাদ প্রজাতন্ত্র—চুক্তি মারফৎ এক শুল্ক ইউনিয়ন ও 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করল। এই 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রে' বাণিজ্য পণ্য, সম্পত্তি ও মূলধনের স্বাধীন গতিবিধি থাকবে বলে স্থির হয়। এর ওপর বন্দর, রেলপথ, নৌবাহন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টেলিকম্যুনিকেশন) প্রভৃতি পরিচালনার জন্য এক যৌথ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিন্তু 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করলেও প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি।

মোটামুটি বলা যায় সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন আর বিষুবরৈখিক শুল্ক ইউনিয়ন হলো অধুনাখ্যাত ব্রাজাভিল শক্তিগোষ্ঠীর সংহতির পথে প্রথম পদক্ষেপ। পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ এইসব দেশের পূর্বোক্ত নামকরণের কারণ, জনসমক্ষে এরা প্রথম গুরুত্ব পায় ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ব্রাজাভিল সম্মেলনের সময়, যদিও তারও আগে অক্টোবর মাসে, এদের মধ্যে সাতটি রাষ্ট্রের নেতারা আবিদিয়ানে মিলিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ঘানা, গিনি, মরক্কো

প্রভৃতি দেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠীত কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে এরা কেউই যোগ দেয় নি।

আবিদিয়ান ও ব্রাজাভিল সম্মেলনের সময় এইসব রাষ্ট্রের নেতারা নিজেদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। এঁদের সমস্যা ছিল, কেমন করে নিজ নিজ দেশের জনমতের বিপক্ষে না গিয়ে আলজেরীয় সমস্যার এমন সমাধান খুঁজে বার করা যায় যা ফ্রান্সের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্তভাব ধীরে ধীরে কেটে গেছে এবং গোষ্ঠীর নেতারা তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়েছেন।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দাকার শহরে দ্বাদশ ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক নীতি ও শুল্ক আইনগুলির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তার কিছুদিন বাদে দ্বাদশ শক্তির রাষ্ট্রনায়কেরা ইয়াউদে শহরে সম্মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বোক্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করেন। এই ইয়াউদে সম্মেলন থেকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার শুল্ক ইউনিয়নকে (যে ব্যবস্থা পূর্ববর্তী দু-বছর যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল) নবজীবন দেওয়া হয় এবং আবিদিয়ানে এই ইউনিয়নের একটি স্থায়ী দফ্তর স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া মূলধন লগ্নী করার এক সাধারণ এলাকা ও ঐক্যবদ্ধ বাজার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গৃহীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয় বিমান পরিবহনের জন্য এক সংযুক্ত কোম্পানী স্থাপন, ঐক্যবদ্ধ ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা সম্পর্কে অনুরূপ নীতি গ্রহণ এবং বিচারব্যবস্থা ও নাগরিকত্বের অধিকারদান সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে গৃহীত আইনকানুনের সামঞ্জস্যবিধান করা হবে। এমনকি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরামর্শ ও এক সম্মিলিত দেশরক্ষা চুক্তির কথাও ঘোষিত হয়।

ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের ঐক্যানুগ প্রগতির আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্ট। ১৯৬০ সালের শেষে যখন তারা আলজেরীয় বিদ্রোহী ও ফরাসী সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার প্রস্তাব করে, তখন এই প্রস্তাবের কার্যকারিতায় তারা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বস্তুত অন্য প্রায় সব আফ্রো-এশীয় দেশ কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আলজেরীয় বিতর্ক শেষ হতে না হতেই এই প্রস্তাবের সমর্থন আসে খোদ আলজেরীয় বিদ্রোহী সরকারের কাছ থেকে। কঙ্গো সঙ্কটেও এই শক্তিবর্গ খুব সাবধানে বলেছে, কঙ্গোর সমস্যা কঙ্গোনীয় জনগণেরই সমাধান করা উচিত। এবং কাসাভুবুকে সমর্থন করলেও তারা গিজেঙ্গা সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য

সমালোচনা থেকে বিরত ছিল। এক কথায়, এরা কঙ্গো সঙ্কটে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এড়িয়ে গেছে।

১৯৬১ সালের মে মাসে ব্রাজাভিল গোষ্ঠী এবং অন্য আটটি রাষ্ট্র (নাইজেরিয়া সিয়েরা লিওন, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, টিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও টোগো) মনরোভিয়ায় মিলিত হয়ে স্থির করে যে অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই বিশটি দেশ এক হয়ে ভোট দেবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংহতির ওপর জোর না দিয়ে, পূর্বোক্ত দেশ সমূহের নেতারা স্থির করেন, অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

পাঁচ

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের কাছে এবার স্পষ্টতর হয়েছে। অতীতে গার্ভের নেতৃত্বে যে 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন চলে আজ আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বরং দ্যু বোয়া প্রভৃতির পরিচালনায় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন অন্তত কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে বলা যায়, যেহেতু মহাদেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল থেকে আজ ঔপনিবেশিক শাসন লুপ্ত। স্বাধীন হবার পর আফ্রিকার দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করবে এমন আশা অনেকে করতেন। আজ বুঝতে পারা যায়: সমস্ত আফ্রিকান দেশ নিয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। অবশ্য আঞ্চলিকভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলতে পারে এবং বিচ্ছিন্নভাবে তার পক্ষে আংশিক সাফল্যলাভও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কৌম, ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির পার্থক্য ছাড়াও আজ মৌলিক মতাদর্শ ও নীতির পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই, আফ্রিকান ঐক্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই দুই বিপরীতমুখী স্রোত। একদিকে, ঘানা, গিনি, মালি, মরক্কো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী; পূর্ব-পশ্চিম বিবাদে নিরপেক্ষতা অবলম্বন ও আফ্রিকায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ যাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে, আইভরী কোস্ট, মরিতানিয়া, সেনেগাল, ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ মধ্য কঙ্গো) প্রভৃতির নেতৃত্বে ব্রাজাভিল গোষ্ঠী; যারা পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি পশ্চিমপন্থী। এই দুই গোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামরিক

ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় বাস্তব অগ্রগতির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনও মেলেনি।

ছয়

পাঠকদের সুবিধার্থে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও আনুষঙ্গিক বর্ষপঞ্জী এখানে সংক্ষিপ্তকারে উপস্থিত করা হলো।

১৯০০—হেনরী সিলভেস্টার-উইলিয়ামস-এর উদ্যোগে বৃটেন ও ওয়েস্ট ইণ্ডিস্ থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি লণ্ডন শহরে মিলিত হন।

১৯১৯—পারী শহরে দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে প্রথম আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২০—ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হয়।

১৯২১—লণ্ডন, ব্রাসেল্স্ ও পারী শহরে দ্বিতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৩—লণ্ডন ও লিসবনে তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৭—নিউ ইয়র্কে চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৯—টিউনিস শহরে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠানের বিফল প্রচেষ্টা।

(অর্থনৈতিক সংকট ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ)

১৯৪৫—ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯৫৭—প্যান-আফ্রিকানিস্ট নেতা কোয়ামে নক্রুমার নেতৃত্বে প্রথম আফ্রিকান-নিগ্রো রাষ্ট্র হিসাবে ঘানার স্বাধীনতালাভ।

এপ্রিল, ১৯৫৮ : আক্রা শহরে আটটি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

ডিসেম্বর, ১৯৫৮ : সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলন (অল্ আফ্রিকান পিপল্‌স কনফারেন্স)।

এপ্রিল, ১৯৫৯ : মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

মে, ১৯৫৯ : ঘানা-গিনি সংযুক্তির কথা ঘোষণা।

মে, ১৯৫৯ : আইভরী কোস্ট, উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে সাহেল্-বেনিন ইউনিয়ন গঠন করে।

জুন, ১৯৫৯ : আইভরী কোস্ট, উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার, দাহোমে,

সেনেগাল, সুদান, ও মরিতানিয়া, পশ্চিম আফ্রিকান শুল্ক ইউনিয়ন গঠন করে।

আগস্ট, ১৯৫৯ : আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য মনরোভিয়ায় সম্মেলন।

জানুয়ারি, ১৯৬০ : টিউনিসে সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় কংগ্রেস। বিষুবরৈখিক শুল্ক ইউনিয়ন গঠন।

এপ্রিল, ১৯৬০ : নক্রুমার আহ্বানে আক্রায় 'নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম' নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলন।

জুন, ১৯৬০ : আদ্দিস আবাবায় ১০টি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

আগস্ট, ১৯৬০ : সুদান ও সেনেগালের বিরোধের ফলে মালি যুক্তরাষ্ট্রের অপমৃত্যু।

অক্টোবর, ১৯৬০ : আবিদিয়ানে আইভরী কোস্ট প্রমুখ ৭টি আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

নভেম্বর, ১৯৬০ : ঘানা ও মালির এক সাধারণ আইন পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ : ঘানা-গিনি ও মালির ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ : দ্বাদশ আফ্রিকান রাষ্ট্রের ব্রাজাভিল সম্মেলন।

জানুয়ারি, ১৯৬১ : কাসাব্লাঙ্কায় ৭টি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ : ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা দাকার শহরে মিলিত হন।

মার্চ, ১৯৬১ : ইয়াউন্দে শহরে ব্রাজাভিল শক্তিবর্গের রাষ্ট্রনেতারা মিলিত হন।

মে, ১৯৬১ : মনরোভিয়া সম্মেলন।

জুন, ১৯৬১ : কাসাব্লাঙ্কায় ৩৮টি দেশের ৪৫টি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন। আন্তর্জাতিক প্রভাববিহীন সারা আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়ন সঙ্ঘ গঠন করার সিদ্ধান্ত।

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

চতুর্থ অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

কালবেলা—সন্ধ্যা। ল্যাণ্ডিং সমেত দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মোচড়ের মুখটায় হাতজোড় করা অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর সেই বিখ্যাত ছবি। ছবিখানা কোনো শিল্পীর আঁকা। ফ্রেমের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছেন গান্ধীজী।

নিচে ল্যাণ্ডিং-এ একটা গোল টেবিল। খান কয়েক চেয়ার। টেবিলে দিশী বিদেশী পত্রিকা ছড়িয়ে আছে। কংশ ও বীরেশ—দুই ভাই সুবোধ বালকের মতো সেই সব পত্রিকা দেখছে চুপ করে। দেখছে আর wits and humour পড়ে নিজের মনেই খিল খিল করে হাসছে শিশুর মতো। মাঝে মাঝে অতি কুতূহলে একজন আর একজনকে দেখাচ্ছে—তখন দুজনেই হাসছে ছেলেমানুষের মতো। ওদের পরনে স্লিপিং স্যুট—ষ্ট্রাইপ দেওয়া কাপড়ের তৈরি। মাথার চুল 'সুবোধ বালকের' মতো সামনে পাট করা। নিরক্ত—রোগী রোগী ভাব।

বীরেশ খুব হাসছে নিঃশব্দে—থেকে থেকে। হঠাৎ হঠাৎ খিল খিল করে। গম্ভীর হয়ে তন্ময়ভাবে পত্রিকা দেখছিল কংশ তার মতো। বীরুর চাপল্য তাকে কৌতূহলী করে।

কংশ : আরে !

বীরেশ : (পত্রিকা দেখিয়ে) সত্যি দাদা ছাখো, এদের হিউমার-টিউমার-গুলো এত subtle হয়! পড়ে ছাখো ! (হাসে)

(কংশ ও বীরেশ দুজনেই তখন হাসে)

[রসময়ের প্রবেশ]

রসময় সোজা ঢুকে নিজের মনে ওপরে উঠে যান সিঁড়ি ধরে। এমন সময় কংশ ও বীরুর অকস্মাৎ হাসি শুনে তিনি ঘুরে তাকান। দেখেন। তাকিয়ে থাকেন। ওরা চুপ করে থাকে।

রসময় : নির্মল আনন্দ উপভোগ করছ বলে মনে হচ্ছে।

(দুজনে উঠে দাঁড়ায়)

কংশ : (মাথা চুলকে) আজ্ঞে না, এই···

রসময় : বেশ। আজকে তোমার তারিখ ছিল না মামলার ?

কংশ : আজ্ঞে না, তারিখ আছে পনোরোই, বুধবার।

রসময় : বুধবার !

কংশ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রসময় : (বীরুকে) তোমার paperও সব তৈরি হয়েছে ?

বীরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রসময় : আশু-র সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কাল নাকি তোমাদের একটা Joint discussion আছে, Barrister সেনও থাকবেন !

বীরেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ ; আশুবাবু খুব করছেন।

রসময় : হ্যাঁ, করবার যা তা সবাই করবে ; শুধু তোমরাই যা আমাকে এতটুকু অনুগ্রহ করলে না।···যা হোক সব বুদ্ধি করে কাজ করবে। আশু যা বলে শুনো,—সে আমার বন্ধু-জন···তার কর্তব্য সে ঠিকই করবেখন···আর···আর কি !

হঠাৎ মুখ তুলতেই গান্ধীজীর ছবি নজরে পড়ে। অস্বস্তি বোধ করেন রসময়। নিজের হাতে নিজেকে আড়াল করে ওপরে উঠে যান দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ত্বরিৎ পায়ে।

কংশ ও বীরু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ পুতলির মতো। হঠাৎ কংশ নিজের হাতের চেটোতে একটা ঘুষি মেরে মনে বলাধান করে নেয়। আর পায়চারি শুরু করে অস্থির ভাবে।

বীরেশ : আচ্ছা দাদা ?

কংশ : (থেমে পড়ে) কি ?

বীরেশ : নাঃ।

কংশ : যাচ্চলে !······আসল কথা কি জানো ভাইটি !

বীরেশ : কি ?

কংশ : দুই আর দুই চার-ও বটে আবার চার না-ও বটে, আমার পড়তায় পড়ল না।

বীরেশ : মানে ?

কংশ : মানে একটা নিশ্চয়ই আছে, একেবারে কি আর বাজে বলিছি।

বীরেশ : পাগলামী করো না।

কংশ : তোমার হিসেবে মিলল না বলে কথাটা পাগলামী বল না।

বীরেশ : পাগলামী নয় তো কি! হুঁঃ, কী একেবারে বিজ্ঞের মতো একটা কথা বললেন! ঐ করেই তো…

কংশ : ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। বিজ্ঞজন যাকে মনে করো তাকে একবার ঘটনাটা জিজ্ঞেসা করে দেখো।

[একাউন্টেন্ট মিঃ ব্যানার্জিসহ কন্ট্রাকটরের প্রবেশ]

কন্ট্রাকটর : এই যে বীরেশবাবু, আছেন দেখি। আর ঘর ছাড়া এখন আর যাবার জায়গাই বা কোথায়! কি বলেন!

বীরেশ : আমি এখন বাড়িতেই থাকি। কোথাও তো বেরুই না।…… কিন্তু খাতাপত্তর!

কন্ট্রাকটর : আছে আছে, সব আছে।…কোথায় গেল।

ব্যানার্জি : নামাচ্ছে গাড়ি থেকে। বিরাট ব্যাপার তো!

কন্ট্রাকটর : তা বটে। গোটা একটা কন্‌স্ট্রাকসনের হিসেব ওর পেটের ভেতর।…এই যে এসে গেছে।

(খাতাপত্রের বিরাট একটা মোট নিয়ে বেয়ারার প্রবেশ)

বীরেশ : এ যে দেখি গন্ধমাদন হে!

কন্ট্রাকটর : তবে! এখন রাখব কোথায়। Secured একটা জায়গায় রাখতে হবে কিন্তু। একখানি কাগজ এধার ওধার হলে রক্ষে নেই।

ব্যানার্জি : হ্যাঁ, important document সব।

বীরেশ : (কংশকে) কোথায় রাখা যায় দাদা বলতো?

কংশ : ছাখো, বাবাকে বলো।

বীরেশ : আসুন আমার সঙ্গে।

[বীরেশ, কন্ট্রাকটর, ব্যানার্জি ও বেয়ারার ওপরে প্রস্থান]

[সুহাসের প্রবেশ]

সুহাস : কে এল রে?

কংশ : ঐ বীরুর বন্ধু Contractor Mr. Ghosh. কি সব account পত্তরের ব্যাপার, খাতাপত্তর নিয়ে এসেছেন।

সুহাস : তাহলে গোলমাল এখনও মেটেনি বল।

কংশ : (নিজের হাত দেখতে দেখতে) আচ্ছা মা, বৃহস্পতি তুঙ্গী হলে তো শুনেছি লোকের ভালো হয়।

সুহাস : হুঁঃ, কিছুই আর এখন আমার মাথায় আসছে না।…এতই কি পাপ করেছিলাম!……এত বৈভবের-ই বা কি দরকার ছিল তোমাদের! সব চাইতে মুস্কিল হয়েছে ওঁকে নিয়ে। মুখে তো কিছু বলবেন না।…বড় গর্ব করেছিলাম, আমার ছেলেদের মতো ছেলে হয় না।

কংশ : আচ্ছা মা, কি লাভ এখন সেই দুঃখু করে!

সুহাস : তোমাদের বংশে কেউ কোনদিন লক্ষপতি ছিল না। কিন্তু নামে যশে তাঁদের সম্মান সমাজে কি কিছু কম ছিল? উনি একজন, সারাজীবন শুধু মাস্টারী-ই করলেন। খুঁটেপুটে যা পেলেন সব ঢাললেন তোমাদের পেছনে। ছেলেপুলে মানুষ হলেই যথেষ্ট হলো। কি হবে অর্থ দিয়ে! হিসেবটাই অন্যরকম। তা তোমরা বুঝলে না, শুঝলে না; পূর্বপুরুষের ধ্যানধারণা পাল্টে দিয়ে নিজেরা যা ভাবলে আর করলে, তাতে বংশের সুনাম তো গেলই, এমনকি নিজেরাও বাঁচতে পারলে না। এই কি হওয়া উচিত ছিল!

কংশ : উচিত অনুচিতের কথা নয় মা। আসল কথা কি জানো, বীরুকে যা বলছিলাম আর কি, আমাদের পড়তায় পড়ল না।

সুহাস : বেহিসেবীর আবার হিসেব কি রে! গোটাটাই তো তোদের ফাটকা। সে আবার কি রকম, নিজের সঙ্গেই নিজে বাজী লড়ছিস তোরা। কোনো মানে হয়!

[কংশ-র চোখে একটা সত্য প্রতিভাত হয় যেন। তবু সে কোনো কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে সেই সত্য মননে]

[অসীম ও কল্যাণীর প্রবেশ]

…এসো বাবা এসো। তোমাদের কথাই ভাবছিলাম।

অসীম : কেন মা। আমি তো আপনাকে বলেই গিছলাম আগে থেকে।

সুহাস : তা বলেছিলে ঠিকই কিন্তু ঠিক ঠিক যে মনে করে আসবে…। যেমনি ভুলো আমার জামাই, তেমনি ভুলো আমার মেয়ে, এসো বাবা।

কল্যাণী : তাই তো বলবে। ধরে নিয়ে এলাম কি না! এক্ষুনি বেরিয়ে

যাচ্ছিল Laboratory-তে। বললাম কথা দিয়েছ না তুমি মাকে খেতে যাবে, Laboratory যাবে মানে! তবে এলো।

অসীম : না মা।

কল্যাণী : এই!

সুহাস : যাক ধরে এনেছিস বেশ করেছিস। নইলে হয়তো আবার শুনতুম কপি-তে য়্যাটম বোমা বেরিয়েছে কপি খাওয়া চলবে না।

কল্যাণী : কিন্তু সত্যিই মা জানো, সব খবরই বাজে ভেবো না। সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত radio active হয়ে গিয়েছে শুনছি। এমন কি শাকপাতা পর্যন্ত যে তুমি নিশ্চিন্তে খাবে তার পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টি নেই।

সুহাস : কি বলিস কি! অসীম।

অসীম : পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ না হলে দেখবেন সাংঘাতিক একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে সংসারে।

সুহাস : সত্যি বলছ।

অসীম : সত্যিই মা।

সুহাস : তাহলে কি হবে! সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে?

অসীম : শৌর্য বীর্যের যা দাপট, তাতে আশঙ্কা করবার কারণ আছে বৈ কি মা!

সুহাস : ওরাও তাহলে বাজী ফেলেছে বলো।

অসীম : কিসের বাজী?

সুহাস : সেই কথাই তো বলছিলাম কংশ-কে। বলছিলাম, নিজের সঙ্গে নিজে বাজী না লড়লে কি আর এমনিতে কেউ এমনধারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে! তা না হলে ছাখো নিজের মঙ্গলামঙ্গল বলেও তো একটা কথা আছে।

অসীম : গোটা ব্যাপারটাই তো আত্মঘাতী।

সুহাস : নিজেই নিজেকে তাড়া করে চলিছি আর কি! ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

অসীম : তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

সুহাস : য়্যাঁ! সে তো মানুষের এক সাংঘাতিক উন্মাদ অবস্থা। কি যেন,

আমার এ সব মাথায়ই আসে না। এই বিয়ে থা, মেয়ে জামাই, ঘর সংসার, ছেলেপুলে, সব মিথ্যে, সব ফাঁকি?

কল্যাণী : কেন তুমি ওর কথা শুনছ বলতো মা! এসো, খেতে দেবে এসো।

সুহাস : চল তাই দেই। যতদিন দেওয়া যায় আর খাওয়া চলে ততক্ষণই ভালো। এসো বাবা অসীম।

[সুহাসের সঙ্গে অসীম ও কল্যাণীর প্রস্থান]

(কংশ এতক্ষণ ঐ একই ভাবে দাঁড়িয়ে সেই বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মায়ের কথাবার্তা শুনছিল। এতক্ষণে তার চিন্তাভাবনাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার বাচনভঙ্গীতে)

কংশ : আমিই আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলিছি···

(কথাটা বলেই কংশ সেই গোলটেবিলটাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে—)

—এই-এই-এই-এই-এই···তাড়া করে নিয়ে যাই···ই-ই-ই-ই-ই!

[বেগে রঞ্জন-এর প্রবেশ]

রঞ্জন : অমল! অমল! অমল আছিস। অমল।

[সিঁড়িতে কল্যাণীর প্রকাশ]

কল্যাণী : কে! ও!

রঞ্জন : অমল অমল, আছে অমল!

কল্যাণী : দেখছি।

[কল্যাণীর প্রস্থান]

রঞ্জন : অমল! অমল!! অমল!!

[সিঁড়িতে অমলের প্রকাশ]

অমল : কে! কে!

রঞ্জন : (কথাটা বলেই রিভলবার চালায়) আমি, তোর বাবা।

(অমল সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে। কংশ কিন্তু দৃকপাতহীন; তখনও চক্রাকারে শব্দ করে নিজেকে তাড়িয়ে চলেছিল, গুলীর শব্দে সে গোলটেবিলের নিচে গিয়ে ঢোকে)

[সিঁড়িতে রসময়-এর প্রকাশ]

রসময় : কি ব্যাপার কি!

রঞ্জন : আপনি ঘরে যান প্রফেসর।

রসময় : আ-হা-হা-হা···(কয়েক ধাপ নামেন)

[সিঁড়িতে অমলের পুনঃপ্রকাশ]

অমল : You swine !

(কথাটা বলে অমলও রঞ্জনকে লক্ষ্য করে রিভলবারের গুলী ছোঁড়ে)

রসময় : অমল ! অমল !

(রঞ্জন কথা না বলে এলোপাথারি গুলী চালায় অমলকে লক্ষ্য করে)

রঞ্জন : সরে যান প্রফেসর ! (অমলকে) রাসকেল তোমাকে আমি···।

(গুলী চালিয়ে যায়)

অমল : বাবা সরে যান !

রসময় : এই ছাখো কেউ কোনো কথা শুনছে না—I say stop it. Stop this fatricidal war for God's sake···রঞ্জন ! অমল ! এই ছাখো···

(হঠাৎ ঝুঁকে পড়া ব্যতিব্যস্ত দেহটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বুক পাঁজরা চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়ান রসময়। গুলীবিদ্ধ হয়েছেন।)

[রঞ্জনের বেগে প্রস্থান]

অমল : বাবা ! বাবা !

রসময় : সামনে পেছনে দুদিক থেকে সমানে গুলী চালাচ্ছে——বললুম, শুনলে না।

(ইতিমধ্যে ওপর নিচ থেকে সবাই ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রসময়কে)

···সমানে গুলী চালাচ্ছে।

(কথাটা বলেই টলে পড়ে যান রসময় সিঁড়ির ওপরেই)

আ-াঃ,···এই যে, বেরুচ্ছে, রক্ত বেরুচ্ছে···

সুহাস : এ আমার কি হলো ! কে করলে আমার এমন সর্বনাশ !

রসময় : রক্তেই কি শোধন হবে !

(হাত উল্টে পড়ে যান হুমড়ি খেয়ে। একটু পরে মাথাটা তোলেন)

Cheerio sons—have courage—onward to victory—Victory in suffering—Victory in defeat—Victory in death.···কংশ, ভেঙে পড়ো না,—বীরু, তুমি আবার শক্ত করে বাঁধ বাঁধো—অসীম, harness the atom to the benefit of man—কল্যাণী !

কল্যাণী : বাবা।

রসময় : কল্যাণময়ী মা আমার !—ওগো !

সুহাস : উঁ ! (নিঃশব্দ কান্নায় মুচড়ে ভেঙে পড়েন) বলো ! কি হলো, বলো ! আমি ঠিক শুনব, বলো ! কথা বলো ! কথা বলো !

অমল : মা !

সুহাস : জানি, পুলিস এলে এর পরেও বলতে হবে—আমার স্বামী স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন।

—যবনিকা—

ভ্রম-সংশোধন

পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃঃ ৬৭৩

পংক্তি ৭, ৮, ৯, প্রস্তরিত স্থলে প্রস্বরিত

অপ্রস্তরিত „ অপ্রস্বরিত

মহানির্বাচন

বিষ্ণু দে

সেও করেছিল বটে মানবিক মনীষার মহা নির্বাচন—
জীবনে অর্জিত সিদ্ধি অথবা কর্মের।
ছেড়েছিল বেহেস্তের প্রাসাদের আশা, চেয়েছিল অভাজন
শিল্পের পরমোৎকর্ষ, রচয়িতা মননধর্মের।

মনীষার অনিশ্চিত অন্ধকারে সে কি থেকে থেকে
যন্ত্রণায় ভেবে দেখে কি বা লাভ? ফুটা পকেটের
গর্তে হাত দিয়ে ভাবে নির্লোভ এ সাধনায় পেকে
সোনালি ফল কি কিছু পেয়েছে সে পিঠের, পেটের?

জানি না, অবশ্য তাকে দেখে মনে হয়, তার ক্ষণিক বিষাদ
তলে তলে মননের ভিতে ভিতে জল দেয়, যার পাকা হাতে
তার ঘর, হাওয়া, আলো, আকাশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ,
আবিশ্ব স্বাধীন হাওয়া নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, দিনে রাতে।

বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, সবই সত্য, তবুও সে আপন কর্মের,—
যে কর্মে সাধনা সিদ্ধি হরিহর, অনিশ্চিতে প্রচ্ছন্ন নিশ্চিত,
সেই কর্মে মুগ্ধ তার গর্বের বিনয়ে আর তুচ্ছ হারজিত
সে বুঝি মানে না তার মনোনীত ক্ষুরধার স্রষ্টার ধর্মের॥

জননী জন্মভূমি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলিনি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত।
আমার ভালবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

হে দেশ, হে আমার জননি—
কেমন করে তোমাকে আমি বলি!

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি 'উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার দুহাতের
দশ আঙুলে তার স্মৃতি
—আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই হে জননি, তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধরে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।

আমরা জীবনকে নিজের মত ক'রে সাজাচ্ছিলাম
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে, হে জননি,
আমরা ভালবাসার কথা ব'লে যাব।

পুনর্বিচার,—এবং একটি সত্য

সিদ্ধেশ্বর সেন

কোনো ভ্রান্তি নয়, এই এক অনুভব
বোধ কিম্বা অভিজ্ঞতা, যাই বলো, তার নাম
এ এক কঠিন রীতি, আহৃত বৈভব
সব ফেলে দিয়ে, পুনর্বার দেখা পরিণাম

এ কী ভ্রান্তি, এ কী নয় নিজস্ব মূল্যের
খোঁজ, যা দিয়ে গড়বে পৃথিবী নাকি জীবন
সে কী এতোই সাধারণ, সে-পাওয়া, সে তুল্যের
উপমান-উপমেয়, শুধুই তা চর্বিত-চর্বণ ?

এ যদি হয়, তা আলো, রঞ্জন-রশ্মির
দেহপট ফুঁড়ে যায়, অস্থি ও পঞ্জর
বুকের জটিল খাঁচা, হৃদপিণ্ড অস্থির
সব সত্যে দেয় মেলে, দেহেমনে জ্বর

এলে রোগী কী দেখবে চোখে, তার উপশমে
একমাত্র দেখা যায় অন্তস্তল, উরঃফলকে, স্টরনমে।

...paint not the object but the
effect it produces

—Mallarme

স্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

হাহাকার জাগিতেছে, রৌদ্রালোক, তুহিন স্মরণ
শীতের সকালে, রাতে, কখনো বা হিম দ্বিপ্রহরে ;
কাঁদিতেছে একা একা তিরেসিয়া, হা অন্ধ ! হনন,
নিষ্ঠুরতা, পলাতক, আকাশ, বাতাস ফেরে ঘরে ।

পাতাল, নবমবৃত্ত বর্ণে স্বর্ণে, গন্ধ, হাহাকার
যেন ঈশ্বরের নাম, দিনঅন্তে কুরুক্ষেত্র, মুখ,
প্রখর, হিমাঙ্ক নিম্নে জাগিতেছে নিঃসীম আকার,
রমণী জায়া ও কন্যা, রৌদ্রালোক, তুহিনের সুখ ।

ডাকি, নাম, বন্ধু, ফুল, ওফেলিয়া শৈশবের নাম,
নামে গন্ধ, স্পর্শে স্মৃতি, নিশি-জাগানিয়া, কোজাগর,
আলোকের ছটা, কান্না, হাওয়া বহিতেছে, পরিণাম :
ডিস্‌ডিমোনার স্বর, মৃত ঠোঁটে অটল অকর ।

ঘুম-ভাঙানিয়া, রিক্ত, জাগিতেছি, বিচূর্ণ, আকার ;
হিম মধ্যরাত্রে এল্‌সিনোরের রৌদ্র অহঙ্কার ।

সাময়িক ব্যর্থতায়

অনন্ত দাশ

কিছুই থাকেনা কাছে ; সমগ্রতা, পুষ্পে অনুরাগ
ছন্দোময় সমারোহে কারা ডাকে প্রণয়ী—সম্মানে
শুধু কণ্ঠ উচ্চারণে সাড়া দেয় স্নেহার্দ্র পরাগ
সর্বদা আমার বুকে রিক্ততা বিষাদে, ব্যবধানে,
প্রসাদিত মুখে কত অক্ষমতা, দারিদ্র্যের ছাপ
সমুদ্রের তীরে যেন বসে আছি দীর্ঘকাল ধরে
শুধু চলাচলে তারা রেখে গেছে দুঃখের প্রলাপ
আমার সাফল্য ঐ চিরন্তন নির্জন অধরে ।

কোথাও রাখিনি তাই স্মৃতিচিহ্ন নামে, অভিধায়
বিক্ষুব্ধ তরল নদী ছুটে যায় দক্ষিণ সাগরে
এমনই ক্ষয়িষ্ণু প্রেম ফেলে যাব পুষ্পে, জলাশয়ে
উত্তরে ঝর্ণার শব্দ চারিদিক নড়ে ওঠে ঝড়ে ।
কিছুই রাখব না হাতে, কিছুই থাকে না চিরকাল
নিকট বন্ধুত্ব, প্রেম, ভেসে যায় শৈশব সকাল ।

সনেট

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার মতন একা কেহ নেই, ছিলনা কখনো।
যেন অন্তরের বুকে একা গাছ গোধূলি বেলায়,—
দিবস নিশীথে শুধু জেগে থাকা। নিসর্গে কি কোনো
আন্তরিক ছায়াবীথি নেই? শুধু রৌদ্রে বেলা যায়।
কোথায় পবিত্র মেঘ মাতৃবৎ আকাশে আমার?
নিষ্করুণ বৃক্ষাবলী রৌদ্রে জ্বলে কঠিন পুরুষ।
চতুষ্পার্শ্বে দ্বাররক্ষী, পদতলে ম্লান মৃত্তিকার
শীতল শরীর। হায়, বেঁচে নেই কেহ নিষ্কলুষ।
একাকী বাঁচিতে আর সাধ নেই, প্রাণ ধারণের
অর্থ যদি কিছুমাত্র থাকে তাহা 'অস্তি'তে নিহিত
এরকম নয়। বুঝি বাগানের অসংখ্য বৃক্ষের
করে করক্ষেপনেই প্রকৃত জীবনে উপনীত
হওয়া যায়। এরকম প্রাণহীন গোধূলি প্রান্তরে
অন্তহীন জাগরণে শূন্যতা। ফিরিতে চাহি ঘরে।

অবিন্যস্ত ব্যাপ্তির উঠোনে

বঙ্কিম মাহাত

সূর্যের রোদ্দুর বেঁকে নেমে গেল ঘরের চৌকাঠে
পাহাড়ের অন্তরালে সূর্যকে ডাকল কেউ তীব্র লোভ ছুঁড়ে
আকাশে ছড়িয়ে পড়ল শতাব্দীর যন্ত্রণায় রক্তাক্ত নদীরা।
নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ আমি ঘরের ভেতরে হাহাকারে
অসহ্য কান্নায় কাকে ডাক দিতে পিদ্দীমের আলো নিভে গেল।
উঠোনের এককোণে পুঁই মাচা, ইঁদুরের শব্দ শোনা গেল;
পেয়ারা গাছের নিচে কবে যেন ঠাকুমাকে বসতে দেখেছিলাম
লেবুর ফুলের গন্ধে অন্ধকারে ঝুলছে আজো
রূপকথার রূপসী কন্যেরা।

কার যেন কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ, ছাখো, রাত্রির হৃদয়
সহস্র ভগ্নাংশে ভেঙে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে গহীনে:
এই অন্ধকার থেকে আরো গাঢ় অন্ধকারে সে আমায় নিয়ে গিয়েছিল
আরো যন্ত্রণার রাজ্যে, আরো কোনো অবিন্যস্ত ব্যাপ্তির উঠোনে।
হৃদয়ে দু-কান পেতে শুনলাম অন্য এক ঝরণার উতরোল ধ্বনি
হারিয়ে গেলাম আমি—উজ্জ্বল উজ্জ্বল আহা
আকাশে কী এতো তারা জ্বলে।

যে প্রশ্ন

তাপস গুপ্ত

রৌদ্রাঘাতে পুনরায় আন্দোলিত হলো শাখাগুলো।
যে প্রশ্ন একদা ছিল কুসুমের তীব্র সম্ভাবনা—
যার ঘ্রাণ পাকে পাকে ছড়াবে জটিল বহুদূর,
আজ বিভাসিত প্রায়; করে আর্ত-পতন ঘোষণা।

বৃক্ষটব কাছাকাছি আসে; কতদীর্ঘ আলাপন,
অযাচিত অনুরাগ সর্পিল মাটির মধ্যস্থলে—
যেনবা ধূসর তীব্র তরঙ্গের মাঝে, অবিশ্বাসে
প্রেমরাগ হতে চায় চিরস্থায়ী অচঞ্চল ধীর।

অথচ সে, ডালপালা রক্তলাল পোড়ামাটি টবে
দৃঢ়স্থির অধিষ্ঠিত; গোপন অঙ্গার ইতিহাস
রয়েছে অন্তর দেহ, সেথা। ঐ প্রীতদের কত
নগ্নকায় ইতিবৃত্ত বক্ষধৃত অক্ষয় অম্লান।

উদ্ভাসিত অন্ধ তারা কঠোর বিরূপ আলোচনে,
চলচ্চিত্র স্বাভাবিক, অশ্লীল মাদক অভিনয়;
নির্মম নিষ্ঠুর স্বর-কোলাহল বোবা পরিবেশে—
শ্বেত রৌদ্র ভাঁজ মধ্যে উদ্যত ছায়ার তরবারি।

রৌদ্রাঘাতে পুনরায় আন্দোলিত হলো শাখাগুলো।
যে প্রশ্ন একদা ছিল কুসুমের তীব্র সম্ভাবনা—
যার ঘ্রাণ পাকে পাকে ছড়াবে জটিল বহুদূর
আজ বিভাসিত প্রায়; করে আর্ত-পতন ঘোষণা।

"শেষ সন্ধ্যা"

সুলেখা সান্যাল

সকালের বাতাস সারেঙ্গীর স্বরে করুণ হয়ে উঠল। বিশ্রী দেখতে একটা যন্ত্র থেকে এক আশ্চর্য, মধুর, করুণ স্বর তুলে তুলে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছেন নিমাইবাবু। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সেই আশ্চর্য স্বরের সাগরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ভাসিয়ে ভাসিয়ে তুলে যেন এক রুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা ভরে ভরে তুলতে লাগলেন।

এত বড় শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ আমি। ব্যবসা করে খাই। রুক্ষ নীরস গদ্যের জীবনে নিজেকে ঠেসে ঠেসে ভরে দিয়েছি চিরকাল। আজ সকালে এসেছিলাম নিমাইবাবুর কাছে, বাজনা শুনতে নয়, এসেছিলাম একটু বৈষয়িক কাজে। তখন তিনি ঐ যন্ত্রটা নিয়ে পরম যত্নে ধুলো ঝাড়ছিলেন। একগাদা সরু সরু টেলিগ্রাফের তারের মতো অসংখ্য তার দেওয়া বেঁটে, কিম্ভূত কিমাকার যন্ত্রটাকে তিনি প্রায় বুকের কাছে তুলে পরিষ্কার করছিলেন এমন করে, মনে হচ্ছিল আদর করছেন।

"কি যন্ত্র মশাই ওটা? কিম্ভূত কিমাকার দেখতে!"

"সারেঙ্গী।"

"ভারী পুরনো হয়ে গেছে তো যন্ত্রটা। বাজান না মশাই শুনি—কখনও তো শুনি নি ও বাজনা।"

"কচিৎ বাঙালীদের হাতে শোনা যায়—শুনবেন আর কি করে? বাঙালীরা সারেঙ্গী বাজায় না—এ লজ্জাই তো ভাঙতে গিয়েছিলাম খাঁ সাহেবের কাছে।"

"শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়েছিলেন তো তাঁকে দিয়ে যে বাঙালীরাও পারে। আমি তো শুনেছি সব যন্ত্রই বাজাতে পারেন আপনি—স্বীকার করিয়ে নেন নি?"

মুহূর্তের মধ্যে কেমন উদাসীন আর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন নিমাইবাবু,

---

সুলেখা সান্যালের এই অপ্রকাশিত গল্পটি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"কেমন ক'রে জানবো বলুন ? সে কথা জানবার আর তো সময় হয় নি..." বলে সারেঙ্গী তুলে নিয়েছিলেন কোলের ওপর আর আঙুলের গায়ে ঘষে ঘষে, অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়, অদ্ভুত স্বর বার করে শুনিয়েছিলেন আমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বর, তাল, লয়, মান কিছু বুঝি না, তবু সে স্বরে যেন কী ছিল। যেন মনে হচ্ছিল কেউ একজন মনের সমস্ত প্রেম, ভক্তি আর প্রার্থনায় নিজেকে নত করে দিয়েছে তার প্রিয়তমের কাছে। তার চোখের জল, শঙ্কা-সংকোচ সব সে বিসর্জন করে দিতে চাইছে কারও পায়ে। না, না, এ সব আমি কিছু ভেবে বলছি না, আমার কোনো কবিত্বও জাগে নি। তবু সেই ঝরে পড়া স্বরের মধ্যে এ জিনিস আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম, করে আমি বিষাদে, বেদনায়, করুণায় আর সহানুভূতিতে অন্য মানুষ হয়ে যেতে লাগলাম। কী যে বলতে এসেছিলাম নিমাইবাবুকে তা আমি আর মনে করতে পারলাম না। আমার তখন সব অন্য অন্য কথা মনে পড়তে লাগল, অন্য অন্য ইচ্ছে জাগতে লাগল। আর তখনই দীর্ঘ করুণ একটা টান শেষ করে সারেঙ্গী থেমে গেল। কিন্তু থেমে যাওয়ার পরেও নিমাইবাবু যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। মনে হলো কী এক দুঃখের পাথারে তিনি এখনও ডুবে রয়েছেন। ম্লান, বিষণ্ণ, উদাস একটা সংকেতে ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে আছে। যেন স্বগতোক্তি করছেন, "এই স্বরটাই শেষ দিয়েছিলেন তিনি।"

"শেষ মানে ? বেশিদিন শেখেন নি বুঝি ?"

"সময় আর পেলেন কোথায় যে শেখাবেন ? যা অহঙ্কার ছিল ! ঠিক অহঙ্কারীর গর্ব নিয়েই একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেবল যন্ত্রটা পড়ে ছিল আমার জন্যে।"

"কী ব্যাপার মশাই ? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন। কিছু কাণ্ডবাণ্ড বুঝি ?"

"হ্যাঁ, সে অনেক কাণ্ড। সে কথা শুনলে আপনার দিন খুব খারাপ হয়ে যাবে বিনয়বাবু, বিশ্রী হয়ে যাবে মনটা। কী দরকার মশাই ওসব শুনে।"

"না না বলুন। এই আমি বসলাম লেপ্টে, না শুনে উঠছিনে।"

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রইলেন নিমাইবাবু, তারপর স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগলেন আপন মনে :

"আমার তখন বয়স অল্প। সাত বছর বয়স থেকে গান, সেতার, বীণ, এস্রাজ সবগুলোর দরজায় ঘুরছি। জীবনে অন্য কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা

নেই। যে কাকা আমাকে মানুষ করেছেন তাঁর কেবল একই আকাঙ্ক্ষা আমাকে সত্যিকারের শিল্পী করে তোলার। তিনি বেঁচে থাকতে তাই আমার একটাই মাত্র কাজ ছিল, দিনে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজ করা। আর কিছু ভাবনা আমার ছিল না, করতামও না। কিন্তু সেই শিল্প একদিন যে আমার পেশায় দাঁড়াবে আমিও আগে ভাবিনি, কাকাও কখনও ভাবেন নি। কাকা মারা যাবার পর স্ত্রী, পুত্র নিয়ে দায়িত্বের বোঝা টানতে গিয়ে আমি পেশাদার হয়ে গেলাম। পথে বসব না জানতাম, বরং পথের লোকেরা আমার বাজনা শুনে ঘরে উঁকি দিয়ে যেত। কোলকাতায় এসেছি, অনেক তখন রোজগার, অনেক ছাত্র। তারা নানা জনে নানা বিদ্যা আহরণ করে আমার কাছ থেকে, কেউ প্রয়োজনে, কেউ অপ্রয়োজনে। কেউ দু-দিন পরে চলে যায় ধৈর্য রাখতে না পেরে, কেউ ধৈর্য ধরে টিকে থাকে।

নিজের ঘরভরা যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গর্ব হয়, আনন্দ হয়, আবার কী এক অভাববোধ মনকে পীড়িত করে। সে হচ্ছে শিল্পীর অসন্তুষ্টি। একদিন একটি ছাত্রের কথায় সে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। সে বললে, 'আমার এক বড়লোক বন্ধু সারেঙ্গী শিখতে চায় মাস্টারমশাই। ওকে নাকি কোন্ অবাঙালী বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছে, বাঙালীদের সারেঙ্গীতে এতটুকু নাম নেই। ওটা অবাঙালী মুসলমানদের একচেটিয়া। আপনার কাছে...।'

শুনে আমার ভারী ক্ষোভ হয়েছিল সেদিন, বলেছিলাম, 'ঠিক আছে। তাকে ঠিক ছ-মাস পরে আমার কাছে এনো। শেখাব তাকে সারেঙ্গী।'

তারপরে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম ভালো সারেঙ্গীর গুরু। চিৎপুরের বাজনার দোকানগুলোতে, কিছু জানাশোনা লোকজনকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে একদিন খোঁজ পেলাম। ওরা বললো, "আপনাকে যেতে হবে তাঁর কাছে। যদি তাঁর সাকরেদদের হাত ছাড়িয়ে আর্জিটা একবার পেশ করতে পারেন, যদি কোনোমতে মন গলাতে পারেন তাঁর, তবে হয়তো শেখালেও শেখাতে পারেন।" জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন ? অনেক টাকাতেও শেখান না ? তবে তাঁর পেশা কি ?'

'টাকা ?'—ওরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'পেশা ?'—সে কথাতেও হাঁ করে রইলো যেন আমি আরব্য উপন্যাসের গল্প শোনাচ্ছি ওদের, যেন ওরা এসব কথা জীবনে শোনে নি। মুচকি হেসে,

মেহেদী দেওয়া দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারা বললে, 'যান। গেলেই বুঝতে পারবেন।'

গেলাম খুঁজে খুঁজে। বৌবাজারের গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির দরজার কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্রের সমস্বর একঘেয়ে নাকী সুরের মধ্যে প্রথম বারের কড়ানাড়া গেল ডুবে। বিরক্ত হয়ে আবার জোরে জোরে কড়া নাড়লাম। মনে হলো একজন কেউ উঠে দরজার কাছে এসেছে। বাকি যন্ত্রগুলো আর্তনাদ করেই চলেছে সেই এক সুরে সা রে গা মা পা ধা নি। সেই যে আমার সেতারের গুরু বলতেন 'এক সাধে তো সব সাধে' অর্থাৎ এক সা রে গা মা পা ধা নি-তেই যদি হাত পাকাতে পারে তো বাকিগুলোর জন্যে ভাবনা নেই। আর যা করতে গিয়ে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজে কতদিন চোখের জল পড়েছে, ধৈর্য হারিয়েছি, এরা দেখছি সেটি আশ্চর্যরকম আয়ত্ত করেছে।

যে দরজা খুলে দিল তার এক হাতে তখনও সারেঙ্গী ধরা। লম্বা, চওড়া শরীর কিন্তু শিশুর মতো সরল মুখ, ছোট ছোট চোখ। সে দরজা খুলে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই একটানা সা রে গা মা পা ধা নি শুনতে শুনতে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে ভাবছি পালাই, তখন ওদের মধ্যে একজনের বোধহয় দয়া হলো, বললে, 'বৈঠিয়ে বাবুজী।'

সারা ঘরখানায় কোথাও বসার জায়গা নেই। ঘরের এককোণে শুধু ভাঙা একটা প্যাকিং বাক্স উপুড় করা। তার ওপর বসে সে যন্ত্রে আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই কথা বলে উঠলাম, 'ইমৃতাজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দু-কানে হাত দিল, দিয়ে হাসলো, বললে, 'তিনি তো ওপর থেকে এখন নামবেন না বাবুজী।'

'কখন নামেন তিনি?'

'সে অনেক দেরি।'

'কত দেরি? আমি না হয় অপেক্ষা করব।'

'আজ তো কিছুতেই হবে না।'

'তবে কবে হবে বলুন, আমি সেইদিনই আসব।'

লোকটি তবু চুপ করে আছে। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টুবুদ্ধি আছে ওর মনে।

আমাকে যারা বলেছিল 'যদি সাকরেদদের হাত ছাড়িয়ে একবার তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন…,' তার অর্থ এখন বুঝতে পারলাম।

সে বললে, 'বাবুজী, খাঁ সাহেব তো এখন আর কাউকে শেখান না।'

'না শেখান্। তবু একবার দেখা করতে চাই আমি।'

নাছোড়বান্দার মতো বসে রইলাম। লোকটি খানিক চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'আজ আপনি যান বাবুজী। তিন দিন বাদে আসবেন। আমি বলে রাখবো তাঁকে। যখন নিচে নামবেন তখন দেখা হবে।'

আমার তবু উঠতে ইচ্ছে নেই। ভাবলাম গল্প করে করে লোকটিকে খুশী রাখি, পরে কাজে লাগবে। 'আপনারা সবাই বুঝি খাঁ সাহেবের দেশের লোক?'—গায়ে পড়ে আলাপ করছি।

'হ্যাঁ বাবুজী।'

'সবাই বুঝি এ বাড়িতে থেকে কাজ-কর্ম করেন কোথাও?'

আমাদের কথা বলা দেখে অন্য লোকগুলি তাদের যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে শিশুর মতো সরল গলায় হেসে উঠল কয়েকজন, 'কাজকর্ম আবার করব কি? সারেঙ্গী বাজাই—এই তো কাজ।'

'তবে চলে কি করে আপনাদের?'

ওরা আবার হেসে উঠলো, 'বাঈ থাকতে, ওস্তাদ থাকতে ওদের আবার চলার ভাবনা।'

'তবে যে বললেন উনি কাউকে শেখান না। এই যে আপনারা দশটা লোক যন্ত্র নিয়ে শিখছেন, কে শেখান তবে?'

'উনি, উনি। হাতে ধরে শেখান না। আমরা রাত তিনটে থেকে উঠে বেলা একটা পর্যন্ত এমনি করে সারে গামা বাজিয়ে যাই, যাব—মাসের পর মাস। উনি যেমন আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা অনায়াসে করে দেন, তেমনি একদিন অনায়াসে এসে নতুন একটা গৎ দিয়ে যান। কিন্তু যতদিন না দেবেন ততদিন এমনি চলবে…ভীষণ কষ্টের বাবুজী। আপনার তাগদ বরবাদ হয়ে যাবে।'

মনে মনে বুঝলাম ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। রাত তিনটেয় উঠে আর মাসের পর মাস সাধনাতেও যদি ওদের তাগদ অটুট থেকে থাকে তবে

আমার তাগদও থাকবে। কিন্তু আজ ওরা আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে দেবে না এটা নিশ্চিত। সুতরাং আজ আমাকে যেতে হবেই।

যে লোকটি তিনদিন পরে আমাকে আসতে বলেছিল তাকে বললাম, 'তিনদিন পরে নয় ভাই। আমি কাল, পরশু রোজ আসব। আপনি একটু বলে রাখবেন আমার কথা।'

তার পরদিন যথাসময়ে গেলাম, গেলাম তার পরদিনও। কিন্তু সেই একই অবস্থা রোজ। সেই সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, সেই মুচকি হাসি, সেই ফিরিয়ে দেওয়া।

তৃতীয় দিনের দিন অবস্থাটা একটু পাল্‌টেছে মনে হলো। কড়া নাড়তে গিয়ে দেখি দরজাটা খোলাই রয়েছে, ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সেই সা রে গা মা পা ধা নি—বেজেই চলেছে কেবল বসবার জন্যে সেই উল্টানো প্যাকিং বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের মাঝখানে এসেছে ছোট্ট একখানি তক্তপোষ, তার ওপর ঘন লাল রঙের একখানি জাজিম পাতা। ওরা আজ সবাই যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আজ আর সেই অবহেলাভরা মুচকি হাসি নেই, ভারী প্রাণখোলা ডাক ভেসে এল, 'আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে।' আমাকে ওরা বসতে ইঙ্গিত করছে তক্তপোষের ওপর।

যে লোকটি প্রথম দিন আমার সঙ্গে কথা বলছিল সে আজ বললে, 'আজ ওস্তাদজীর সঙ্গে দেখা হবে বাবুজী।'

ওরাও সকলে মাথা নেড়ে সমর্থন করে ডুবে গেল নিজেদের সাধনায়। সেই লোকটিও বাজাতে লাগল মাথা নিচু করে, একসময় তার আঙুল আবার থেমে গেল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা সে বুঝে নেবার চেষ্টা করলে, তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'বাবুজী, এই যে তিনদিন ধরে আপনি কষ্ট পেলেন এতে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই।'

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে সে বললে, 'বুঝলেন না বাবুজী। ওটা ওস্তাদেরই আদেশ। একদিন, দু-দিন, তিনদিন ধরেও যে ধৈর্য রাখতে পারে তাকে দেখা দেন তিনি। যাদের ধৈর্য নেই—তারা আর আসে না। আপনি আমার পরীক্ষায় পাস করেছেন বাবুজী।'

'এইবার শেখাবেন তো আমাকে?' পাশের যন্ত্রটাকে কোলের ওপর তুলে নিই।

'শেখাবেন কিনা সে তাঁর মর্জী। আমার কাছে আপনি পাস। গুরুজীর কাছে আরও পরীক্ষা আছে…'

হঠাৎ সারেঙ্গীগুলো থেমে গেল, ঘরের সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়িতে খড়মের শব্দ করে কেউ একজন নেমে আসছেন। খালি গা, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, প্রৌঢ় এক সৌম্য চেহারার মানুষ। কাঁধের ওপর একখানা তোয়ালে ফেলে নেমে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলেন। জল ঢালার শব্দ পেলাম, বুঝলাম স্নান করতে নেমেছেন তিনি।

ওরা ততোক্ষণে ঘরের সঙ্গে লাগানো বারান্দায় মস্ত একটা উনুন কোথা থেকে টেনে এনে রাখলো, তার ওপর চাপানো একটা উৎসব বাড়ির রান্নার হাঁড়ি।

মাথা মুছতে মুছতে স্মিত প্রসন্নমুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। ওদের মধ্যে দু-জনে মিলে পাশের কোনো একটা ঘর থেকে বয়ে নিয়ে এলো একটা কাঠের মন্দিরের মতো জিনিস, ঘরের মাঝখানে রাখল, সামনে পেতে দিল একটা আসন। সে মন্দিরে কি আছে দেখবার জন্যে একটু উঁকি দিলাম আমি চেষ্টা করে, দেখি, কিছু নয়—একপাশে একটি কালীর ফটো, আর একপাশে পাথরে গড়া ছোট একটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। তারই সামনে চুপ করে বসে আছেন তিনি। একখানা বড় কাঠের থালায় হাঁড়িতে যা সেদ্ধ হচ্ছিল তারই খানিকটা রেখে দিল ওদেরই একজন কেউ। দেখি, তা এক ধরনের খিচুড়ী—চাল, ডাল, ঘি, বাদাম, পেস্তা মেশানো খাদ্য। লম্বা একটা হাতা দিয়ে তা থেকে একটু প্রসাদ প্রথমেই তিনি অনায়াসে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন কথা না বলে, হাত পেতে গ্রহণ করলাম আমি, খেলাম। তারপর ওরা প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল তাঁর হাতের দেওয়া প্রসাদ, আবার সরে গেল কাঠের মন্দিরটা।

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, সেই স্মিত হাসি নিয়েই উঠে এসে আমার পাশে বসলেন, 'আপনার কথা শুনেছি। রোজ এসে ফিরে গেছেন। তার মানে গরজ আছে খুব।' তারপর মুখের সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা কাঠিন্য, একটা রূঢ় জিজ্ঞাসার ছাপ ফুটে উঠল, 'সারেঙ্গী শিখতে চান কেন? আরও তো কত যন্ত্র আছে? এ বড় তখলিফের ব্যাপার, এ আপনি পারবেন না বাবুজী।'

'পারব ওস্তাদজী—আপনি যদি মেহেরবানী করেন একটু।'

'গান-বাজনা এর আগে কিছু করা অভ্যাস আছে?'

আমি সতর্ক ছিলাম সেকথা স্বীকার করবো না বলে, তাহলে হয়তো কিছুতেই শেখাতে রাজী হবেন না উনি। বললাম, 'না, কোনো অভ্যাস নেই, সামান্য স্বরবোধ আছে, সারেঙ্গী শেখারই আমার খুব ইচ্ছে।'

আমার মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, একটু হাসলেন কি ভেবে। আমার সত্যিকার পরিচয় ধরে ফেললেন নাকি?

না, কোনো কথাই তুললেন না সে সম্বন্ধে, গম্ভীর হয়ে অন্য কথা বললেন, 'কোনো ওস্তাদের কাছে শিখতে হলে আগে নাড়া বাঁধতে হয় জানেন?'

'শুনেছি, কখনও বাঁধি নি। বলুন আমাকে সেজন্যে কি করতে হবে?'

'সোনা, চাঁদি আর অন্য অনেক জিনিস লাগবে। শ' রূপেয়া খরচ লাগবে আপনার।'

'সে খরচ আমি নিশ্চয়ই দেব। আমি টাকা দিয়ে দেব, আপনি আয়োজনটা করে দিন।'

একটু গম্ভীর হয়ে আবার কি ভাবলেন, বললেন, 'সপ্তাহে দু-দিন করে শেখাব আমি। প্রতিদিনের জন্যে পঁচিশ টাকা করে লাগবে—পারবেন দিতে?'

আমাকে কি উনি পরীক্ষা করছেন? কেমন জেদ চেপে গেল, বললাম, 'পারব নিশ্চয়ই। বেশি হলেও পারব।'

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'বাবুজী, আপনি করেন কি?'

একটা ঢোঁক গিললাম আমি। মিথ্যে কথা বলতে বুকের ভেতরে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল, তবু বললাম, 'ব্যবসা করি।'

কি বুঝে হাসলেন একটু কে জানে। উঠে দাঁড়ালেন, 'বেশ এরপর যেদিন ইচ্ছে আপনার আসবেন—নাড়া বাঁধতে। তারপর শেখাব।'

'কালই একশো টাকা দিয়ে যাব আমি। পরশু থেকে শিখতে চাই।'

'কাল! পরশু! আচ্ছা!' মনে হলো মুখ টিপে ওঁর সাকরেদদের মতো উনিও মুচকি হাসছেন। উনি কি ভেবেছেন টাকার জন্যে আমি যাবো পিছিয়ে? আমার তখন আয় মাসে হাজার দেড়েক। সামান্য কটা টাকার ভয় দেখিয়ে উনি কি আমাকে ভয় পাওয়াতে চান?

একশো টাকা পরদিন গিয়ে দিয়ে এলাম সাকরেদদের হাতে।

তার পরদিন গেলাম তাঁরই নির্দেশমতো। আজও দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি ঘর শূন্য, তক্তপোষের ওপর আজ সাদা চাদর পাতা, দু-পাশে দুটো তাকিয়া পড়েছে, ইমতাজ খাঁ বসে বসে পান খাচ্ছেন। পাশে আর একটা সারেঙ্গী, তার ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছেন আপন মনে।

আমি যেতেই আজ ভারী প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, 'আইয়ে বাবুজী।' টাকা কটি পায়ের কাছে রেখে বসলাম পায়ের কাছে। উনি গুরু, আমি শিষ্য—অন্য কিছু আমার মনে পড়ল না কারণ শিল্পীর জাত নেই। উনি হাত ধরে আমাকে পাশে বসালেন, টাকাগুলো তেমনি রইল পড়ে, একবার ফিরেও তাকালেন না, তুলবার চেষ্টাও করলেন না। সারেঙ্গী ধরা শেখাতে লাগলেন আমাকে। শিখবার প্রক্রিয়াটা দেখালেন। কঠিন সে প্রক্রিয়া। আমি এতগুলো যন্ত্র বাজাই কিন্তু কোনো যন্ত্র শিখবার এমন অদ্ভুত প্রক্রিয়া আমি জানি না। স্বর বেঁধে দিলেন। সব আমি অবোধ শিশুর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কারণ আমি যে কিছুই জানি না।

'আজ এই পর্যন্ত। বাড়িতে অভ্যেস করে কালই আসবেন। খুব কঠিন জিনিস, ধৈর্য রাখতে পারলে তবে।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলেন আস্তে আস্তে। টাকাগুলো তেমনি পড়ে রইল তক্তপোষের ওপর। আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

বাড়িতে গিয়ে সারেঙ্গী সাধতে বসে আমার প্রায় কান্না পেয়ে গেল। এ কী প্রক্রিয়া! জানি সারেঙ্গী বাজাতে হয় আঙুলের উল্টোপিঠে ঘষে ঘষে কিন্তু আমার গুরু যা দিয়েছেন সে রকম প্রক্রিয়ার কথা জীবনে শুনি নি—জানি না। আঙুলগুলো জালা করতে লাগল, ঘষায় ঘষায় ছাল উঠে গেল, কিন্তু কী যে জেদ চেপেছে। অন্য সব ঘরভরা আয়োজনকে আমার এ জেদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। মনে হলো কত সহজে এ সব শিখেছি আমি, তার তুলনায় কত কঠিন এ সাধনা! কিন্তু সত্যিই কি কঠিন? নাকি আমাকে পরীক্ষা করছেন উনি? ওঁর সাকরেদদের সেই গা জালানো মুচকি হাসি মনে পড়তে লাগল। ওঁর সেই সন্ধানী চোখ দুটোর দৃষ্টির কথা মনে পড়তে লাগল আর প্রতিজ্ঞায় আমি দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলাম। ওই মুচকি হাসিকে আমি বিস্ময়ে পরিণত করব।

সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াকেই আয়ত্ত করে নিয়ে পরদিন আবার গেলাম টাকা

নিয়ে। ঠিক তেমনি খালি ঘরে চুপ করে বসে আছেন তিনি। আমাকে ঢুকতে দেখে হয়তো সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখে কিন্তু পরক্ষণেই হাসি দিয়ে তা তিনি মুছে ফেললেন। তেমনি টাকা রইল পড়ে, বললেন, 'বাজান।' বাজালাম। সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াতেই যতোটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম শোনালাম তাঁকে। দু-চোখের বিস্ময় এবার স্থায়ী হয়ে রইলো, বললেন, 'আপনি পারবেন বাবুজী। এইভাবে সারেঙ্গী বাজানোর নিয়ম নয়। আমি আপনার ইচ্ছেটা পরীক্ষা করার জন্যে এ উপায় দিয়েছিলাম। বাবুজী আপনি তো অদ্ভুত। তাই ঠিক করে নিয়ে এসেছেন?' পিঠের ওপর হাত রাখলেন, যেন আদর করে। তারপর সত্যিকারের প্রক্রিয়াটা দিলেন শিখিয়ে। অনেক বাজনা শেখা হাতে সেটা আমার কাছে এতটুকু কঠিন মনে হলো না। আশা হলো পরীক্ষার পালা তাঁর শেষ হয়েছে হয়তো।

মাসখানেক এমনিই চলল। নিয়মিত যাই, শিখি। সেই তিনি তেমনি অপেক্ষা করে থাকেন আমার জন্যে, সেই তেমনি টাকাগুলো তক্তপোষে পড়ে থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে উঠে চলে যান।

সেদিনও যথাসময়ে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের চেহারা আবার আগের মতন। সেই তেমনি উল্টানো প্যাকিং বাক্স, তেমনি দশটা যন্ত্রের একটানা সা রে গা মা পা ধা নি। শুনলাম ওস্তাদজী মুজরায় গেছেন, বেনারস না লক্ষ্ণৌ—কোথায়।

'কবে ফিরবেন?'

'ঠিক নেই। সাতদিন হতে পারে, একমাস হতে পারে, তিনমাস হতে পারে।'

নাড়া বেঁধেছি। এসেছি শিখতে। টাকাতো ওঁর নামেই আনা। টাকাগুলো আমি সাকরেদদের মধ্যে একজনকে দিয়ে এলাম।

এমনি চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। যখনই যাই, শুনি, 'এখনও ফেরেন নি তিনি।' কবে ফিরবেন তা ওরা জানে না। নিয়মিত দিনে গিয়ে টাকাটা রেখে আসি, ওরা তেমনি মুচকি হাসে।

এমনি করে তিনমাস কেটে গেছে। আমি ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি নির্দিষ্ট দিনে সারেঙ্গী ঘাড়ে বয়ে বয়ে। অনেক ছাত্র ছেড়ে গেছে আমাকে দিনের পর দিন সময়মতো না পেয়ে।

আজও গিয়েছিলাম—শেষবারের মতো। ভেবেছিলাম আজও যদি তিনি না ফিরে থাকেন তবে আর যাব না। এই শেষ!

সেদিন খুব সকাল সকাল গিয়েছিলাম, ভেজানো দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তেমনি সবাই বসে আছে সারেঙ্গী হাতে কিন্তু আজ ওরা বাজাচ্ছে না, কী এক আগ্রহে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। আমাকে দেখেই সমস্বরে বলে উঠল, 'আইয়ে বাবুজী, আইয়ে।'

বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমার হাত ধরলে, 'তখ্‌লিফ্‌ আপনার শেষ হ'য়েছে বাবুজী। যান্‌—ওপরে চলে যান।'

'ওপরে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুজী, ওপরে। এই সিঁড়ি—উঠে যান। ওস্তাদজী ওপরে অপেক্ষা করে আছেন আপনার জন্যে।'

'ফিরেছেন তিনি তবে?'

সে আবার মুচকি হাসলো, 'সে সব বাৎচিৎ তাঁর সঙ্গে করবেন বাবুজী, লেকিন ওপরে আপনার ডাক পড়েছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অভিমানে, ক্ষোভে মন আমার ভরে তুলেছিলাম। দেখা হলে কী বলব ওস্তাদজীকে সব মহড়া দিচ্ছিলাম। বলব, 'আমার আর শেখার ইচ্ছে নেই সারেঙ্গী। কিন্তু একটা জিনিস শিখে নিলাম—সে তোমাদের! তোমরা আসলে শিল্পী হলে কি হবে, নিজেদের অহঙ্কার আর জাতের কৌলিন্য ছাড়তে পারনি আজও, না হ'লে অনর্থক এমন হয়রানী করে মানুষকে!'

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে উঠতেই ভারী সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কোনো মন্দিরে ধূপ-দীপ জালিয়ে কারা পুজো করছে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, চন্দনের গন্ধে সকালবেলার আলো-বাতাস যেন ভরে উঠেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখি রেলিঙ-ঘেরা চওড়া বারান্দার একপাশে একটি সাদা পাথরের মন্দির। তার মধ্যে অপূর্ব সুন্দর এক যুগলমূর্তি, রাধা আর কৃষ্ণ। রাধাকে কে যেন মনের মতো করে সাজিয়েছে—পরনে দামী পোষাক, পাথরের শরীরে নানা অলঙ্কার, মাথায় তাঁর মুকুট—যেন বিজয়িনীর মূর্তি। কৃষ্ণের নিরাভরণ মূর্তি, হাতে শুধু একটি রূপোর বাঁশী। আর তার সামনে দুটি আসনে দু-জন মানুষ, একজন ওস্তাদ ইম্‌তাজ খাঁ। অন্যজন—জানি না আমি তিনি কি! হিন্দু না মুসলমান, বাঙালী না অবাঙালী? ভেজা চুলের গোছা

পিঠের ওপর ছড়ানো, গরদের একখানি শাড়ি কুঁচিয়ে পরা, রেশমী ব্লাউজ লম্বা হাতার।

আমাকে দেখে ওস্তাদজী ইসারা করলেন একটু, বুঝলাম বসতে বলছেন ঘরে।

নিরাভরণ অথচ পরিচ্ছন্ন একটি গালিচা পাতা ঘরে গিয়ে বসলাম। একপাশে পাখোয়াজ, আর একপাশে একটি তানপুরা নিয়ে দু-টি মানুষ বসে আছেন।

কখন একটা মৃদু সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিধার, পাখোয়াজ আর তানপুরার সঙ্গতের সঙ্গে। দু-টি নারী পুরুষের সাধনা করা শিক্ষিত গলার সুরে কী যে যাদু ছিল। কী যেন গাইলেন ওঁরা! মনে হলো সামস্তোত্র, মনে হলো কোনো পদাবলী, মনে হলো কবীরের ভজন না হয় কোনো উর্দু প্রার্থনা। আমি সে সব তলিয়ে কিছুই বুঝলাম না। সুরের জালে আমি জড়িয়ে গিয়ে সম্মোহিত হয়ে গেছি।

সময় কেটে গেছে কোথা দিয়ে। ওস্তাদজী গান শেষ করে ঘরে এসে বসেছেন আর সেই দীপ্ত নারী মূর্তি (নিশ্চয়ই ওস্তাদজীর সঙ্গিনী) হাসিমুখে আমার সামনে সুন্দর পাথরের থালায় রেখেছেন প্রসাদী, রেখেছেন সরবৎ। আমি নবাগত বলে আমাকেই প্রথম সম্বর্ধনা জানালেন তিনি। সকালের আলো এসে তাঁর চোখে, মুখে পড়েছে, খোলা চুলে পড়েছে। পরে জেনেছিলাম ইনিই সেই বিখ্যাত রোসেনা বাঈ। থাক্ সে কথা।

আস্তে আস্তে সব মোহ কেটে গেল। বাস্তবে ফিরে এলাম আবার। সেই তেমনি স্মিত হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ইমতাজ খাঁ, 'বাবুজী ভালো আছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ক্ষোভ আর অভিমানে আমার যেন গলা বুজে এলো, বললাম, 'শরীর ভালো আছে কিন্তু মন ভালো ছিল না ওস্তাদজী? তিনমাস পরে ফিরলেন আপনি। বেনারস গিয়েছিলাম মুজরায়, ওরা বললো?'

হাসলেন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে, 'ওদের ওইরকমই নির্দেশ দেওয়া ছিল।'

কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি বাবুজী। জানি আপনি খুব দুঃখ পাবেন, রাগও হবে। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় নেই। আমি আজকাল কাউকে

শেখাই না কিন্তু আপনার ধৈর্য দেখে মায়া হয়েছে আমার। দুটো জিনিসের অভাব হলে মানুষ এ পথ ছেড়ে দেয়। আমি আপনাকে টাকার পরীক্ষা করেছি, দেখেছি টাকার জন্যে পরোয়া নেই আপনার। বাকি ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা—তাতেও আপনি জিতেছেন। নইলে আমি আমার ঘরে ডেকে আনতাম না আপনাকে।'

কথাগুলো ভারি মিষ্টি। কখনও হেসে, কখনও গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন কথাগুলো কিন্তু আমার তখনও ক্ষোভ যায় নি। তখনও অভিমানের একটা সূক্ষ্ম জাল আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তারই ঝোঁকে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, 'আমি কিন্তু রোজ এসে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে গেছি আপনাকে—ওদের হাতে। যা আপনি বলেছিলেন।'

'রুপেয়া!' একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে, 'সমুচা লে যাইয়ে আপ্'—উঠে ঘরের একটা কোণ থেকে ছোট্ট একটা রেশমী থলি বার করে আমার পায়ের কাছে রাখলেন, 'এ টাকা যাবার সময় আপনার হাতে দিতাম। কথাটা ওঠালেন তাই। এ পর্যন্ত যা টাকা দিয়েছেন সব আছে ওর মধ্যে। টাকার জন্যে আমি শেখাইনা বাবুজী।'

ইস্! লজ্জায়, অপমানে নিজেকে বিকৃত মনে হতে লাগলো। হঠাৎ ওঁর দু'টি হাত ধরলাম আমি। তখন অন্য এক ভাবে চোখ আমার ছলছলিয়ে উঠেছে, অন্য আর এক আশঙ্কায় গলা বুজে আসছে। বললাম, 'ওস্তাদজী। তাহলে আপনি কি আমাকে বিদায় করে দিচ্ছেন? আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'আরে ছি ছি'—দু'হাতে আমাকে প্রায় আলিঙ্গন করলেন তিনি, 'রাগ তো আমি করিনি। বরং কত তথ্‌লিফ্ আপনাকে আমি দিয়েছি এই তিনমাস ধরে, আপনি বরং আমাকে ক্ষমা করে দিন বাবুজী। আজ থেকে আমরা দোস্ত্। কাল থেকে রোজ আপনি আসবেন। কোনো এত্তেলা লাগবে না। এই ওপরে, সোজা উঠে আসবেন, আমি না থাকি আপনার বহিন্ রোসেনা থাকবে। দরকার মতো ও আপনাকে নতুন পাঠ দিয়ে দিতে পারবে।'

তবু সেই অর্থের প্রশ্ন আমার মন থেকে যায় না, মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করি, 'কি দেবো আপনাকে?'

'কি আবার? যদি কিছু দিতে চান—দোকান থেকে ভালো জর্দা দেওয়া দু-খিলি পান।'

'না, না,'—হেসে ফেললাম, 'আদান-প্রদান না থাকলে কেমন লাগে যে।'

'বেশ মাসে পাঁচটাকা দেবেন, যদি মন না শোনে। টাকা নিয়ে কী করবো আমি? খাইতো নিরামিষ, রোসেনা আর আমি একটা মুজরা নিই বছরে—বছর চলে যায়…'

সারেঙ্গীর প্রয়োজনীয় তত্ব, গৎ শেখাতে লাগলেন। অন্ত যন্ত্রে যার আঙুল অভ্যস্ত, এ সব শেখা তার কাছে নতুন নয়। তবু মিথ্যে যখন বলেছি তখন বোকামীর ভান করতেই হবে। উনি কিন্তু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন, বারে বারে তাকাতে লাগলেন আমার আঙুলের দিকে।

সেদিনকার মত শেখানো হয়ে গেলে বললেন, 'বস্থন বাবুজী, গান শুনবেন? শুনবেন আমার সারেঙ্গী?'

বিহ্বল খুশিতে মাথা নাড়লাম আমি। তখন রোসেনা বাঈ এসে আসরে বসলেন, পাখোয়াজে তাল পড়ল, তানপুরার সুর চড়ল, সারেঙ্গী তুলে নিলেন খাঁ সাহেব আর সুরের সুধাসাগরে ডুবে গেলাম আমি। ভৈঁরোর সুরে সারেঙ্গী বাজতে লাগল, গান চলতে লাগল।

তারপর এক সময় রোদ এসে পড়ল ঘরে—সারেঙ্গী নিয়ে উঠে এলাম আমি। সমস্ত পথ যেন আমার কাছে সারেঙ্গীর একটানা সুরের মতো মনে হতে লাগল।

মাঝখানে একবার কয়েকদিনের জন্যে মুজরায় গেলেন ইমতাজ খাঁ, রোসেনা বাঈকে সঙ্গে নিয়ে। সেই কটা দিন ছাড়া তার পরের একটা বছর ধরে আর কোনো ব্যাঘাত হয়নি শেখায়। আমি তাঁর কাছে আর শিক্ষার্থী ছিলাম না, হয়ে গিয়েছিলাম দোস্ত্, আর রোসেনা বাঈ-এর ভাইয়া।

একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রোজই যাবার আগে তাঁর বাঁধা সুরে সারেঙ্গী বেঁধে নিয়ে যাই। সেদিন ভুলে গেছি, বেঁধেছি আমার অন্ত যন্ত্রের সুরের প্রক্রিয়ায়। সারেঙ্গীর ওপর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি দিয়ে একবার মাত্র স্পর্শ করলেন তারগুলো, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বসে রইলেন গম্ভীর হয়ে, উচ্চকণ্ঠে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'রোসেনা।'

রোসেনা বাঈ বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে।

'রোসেনা, তোমার ভাইয়াকে আর শেখাবো না আমি।'

'সে কি? কেন?'—বড়ো বড়ো প্রশান্ত চোখ তুলে রোসেনা বাঈ বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন।

'তোমার এই ভাইয়া একটা মস্ত মিথ্যুক। ওস্তাদকে ঠকিয়েছে। আমার কি শেখানো উচিত—তুমিই বল?'

তখনও জিনিসটা আমার বোধগম্য হয়নি। লজ্জায়, গ্লানিতে মাথা নিচু করে বসে আছি আমি। রোসেনা বাঈ দেখি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বেশ তুমি না শেখাও, শেখাবো আমি। ভাইয়া মাথা তোলো, কিচ্ছু লজ্জার ব্যাপার নয়।'

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ইম্‌তাজ খাঁ বললেন, 'সত্যি কথা বলতো দোস্ত্, কটা বাজনা তুমি জানো? কত বছর ধরে গান শিখছো? আমি ধরতে পারিনি ভেবেছ? অনেকদিন আগেই ধরেছি।'

এতক্ষণে সংশয় কাটল আমার, মাথা তুলে বললাম, 'হ্যাঁ, এই একটা ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। ভয় ছিল যদি না শেখান! তার জন্যে কী শাস্তি দেবেন দিন্।'

'শাস্তি?' কপট রাগের ভান করে, গলার স্বর গম্ভীর করে তিনি বললেন, 'তুমি সেতার শেখাবে রোসেনকে—এই তোমার শাস্তি। ওর নাকি এই মুসলমানী বাজনা সারেঙ্গীর চেয়ে সেতার বেশী ভালো লাগে। ও আজও ভুলতে পারল না যে আমি মুসলমান……।'

রোসেনা বাঈ একটুখানি লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন, তারপর বললেন, 'যাই ভাইয়ার জন্যে পান নিয়ে আসি। নাড়া বাঁধবো মিষ্টি পান দিয়ে।'

ইমতাজ্ খাঁ সেই চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, 'তুমি কি আমাদের এই জীবনকে ঘেন্না করো দোস্ত?'

'না তো'—ঘাড় নাড়লাম আমি।

'না, তোমরা ঠিক এ ভাবে হয়তো দেখতে অভ্যস্ত নও। কি করবো—উপায় নেই। তোমাদের এই রোসেনা বাঈ, এর নাম ছিল পুতুল, ছিল হিন্দু ঘরের বিধবা। অল্পবয়সের লোভানীতে ভুলে যে পুরুষটির সঙ্গে ও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে কেবল বাইরের জগতে ওকে আছড়ে ফেলে দিয়েই গেল, কেউ ওকে আর তুলে নিল না। ও কেমন করে কার হাত বদল হয়ে হয়ে গিয়ে পড়েছিল লক্ষ্ণৌতে, সেখানে মুসলমানী বাঁদীর পরিচয়ে আমার মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু ও যে তা নয় তা আমিই আবিষ্কার করেছিলাম কারণ বাঁদী হতে হলে যে সব মুসলমানী কায়দাকানুন

জানা থাকা দরকার তা ও জানত না। ওকে গানবাজনার পথে আমিই এনেছিলাম—আজও ও ঐ পথেই আছে। আমাকে বিয়ে করতে হলে ওকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়—ও চেয়েছিল, আমিই দিই নি, বলেছি না হল বিয়ে, শিল্পীর আবার আলাদা ধর্ম কি আর তার পরিবর্তনই বা কি ? তোমার বিশ্বাস তোমার, আমার বিশ্বাস আমার—আর আমাদের দুজনের বিশ্বাস মিলে তো গান আর সুর। যেমন করে চললে তুমি সুখী হও আমি তেমনি করেই চলব……

রোসেনা বাঈও একদিন বলেছিলেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, "আমার জন্যে নিজের জীবনের ধারা উনি একেবারে দিয়েছেন পাল্টে এ কথা কেই বা বিশ্বাস করবে ? উনি নিরামিশাষী—ওঁর চালচলন এমন করে রেখেছেন যে ফকিরের চেয়ে বেশী নয়। কেন ? পাছে কোথাও আমার মনে এতটুকু ব্যথা লাগে। আর আমার নিজের কথা যদি বল, আমি নিজেকে হিন্দু ভাবিনা, মুসলমানও ভাবিনা। যে মানুষের সঙ্গে থেকে নিজের মূল্য পেয়েছি আমি নিজেকে কেবল সেই মানুষ হিসাবে ভাবি।'

এমনি চলছিল। বন্ধুত্বে, স্নেহে, সুরে বৌবাজারের সেই গলির দোতলার একটা ঘরে আমার মনটাকে রোজ রেখে আসতাম আমি। কেবল সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে খাঁ সাহেবের বেঁধে দেওয়া সুরের স্পর্শ। বাড়িতে বসে যখন বাজাতাম তখন যেন ওমনি হাসিমুখ রোসেনা বাঈ-এর মিষ্টি সুরেলা গলায় ডাক আস্‌তো 'ভাইয়া', ইমতাজ খাঁর গুরুগম্ভীর ডাক শুনতাম 'দোস্ত'।

কিন্তু একটা রক্তের লোভ যে রক্তমাখা থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল এ বিষয়ে একেবারে সচেতন ছিলাম না আমরা। আমি ছিলাম না, ইমতাজ খাঁ ছিলেন না, রোসেনা বাঈ ছিলেন না—ছিল না আরও হাজার হাজার আমাদের মত বোকা লোক। কিন্তু সে এগিয়ে আসছিল নিঃশব্দে, অগোচরে।

সেই বোধহয় আমি শেষ গেলাম ওদের কাছে। কদিন আগে একটা নতুন একটা কঠিন গৎ দিয়েছিলেন। সেদিন সেটা শুদ্ধ নির্ভুলভাবে বাজিয়ে শোনালাম তাঁকে। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছিল। সারেঙ্গীর ওপর আমার হাত চলছিল দ্রুত, নির্ভুল, পাশে চোখ বুজে বসে ছিলেন ইমতাজ খাঁ, ওপাশে রোসেনা বাঈ। ধূপের গন্ধ উঠছিল বড় ধূপাধার থেকে, সামনে একটা পেতলের থালায় যুথী, মল্লিকা, বেলফুল।

আমার বাজনা থেমে গেলে রোসেনা বাঈ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন

আমার দিকে। ইমতাজ খাঁ চোখ খুললেন অনেক পরে, যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে উঠে এলেন। বললেন, 'দোস্ত্, তোমাকে আজ আমার শ্রেষ্ঠ বাজনাটি শোনাই। আমার রোসেনার ওটা খুব পছন্দ—অনেকদিন বাজাই না। বাজাই রোসেনা ?'

রোসেনা বাঈ হঠাৎ আমার সামনেই কেঁদে ফেললেন। সে কান্নার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে আসতেই তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন, 'আজ সকাল থেকে তোমার কী হয়েছে বলতো ? কেবল আমাকে কাঁদাচ্ছো।'

কেমন ম্লান, বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠল ওস্তাদের ঠোঁটে, উত্তর দিলেন না সে প্রশ্নের, সারেঙ্গীটাকে কোলের ওপর তুলে নিলেন। তাঁর ঘরানায় তিনি বাজালেন, আমার কানে বাজতে লাগল বেলা শেষের পূরবীর করুণ তান। মনে হল বাইরের যে ধোঁয়া-ধুলো ভরা আকাশটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনে তাতে কেবল অস্ত রবির রক্তাভ আলোই ছড়িয়ে পড়েনি, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে রোসেনা বাঈ-এর চোখের জল, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে ইম্‌তাজ খাঁর বিষণ্ণ ম্লান হাসি, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার বিস্ময়।

আস্তে আস্তে সে সুর ক'টা ঝঙ্কার শেষবারের মত তুলে মরে গেল রিণ্ রিণ্ করতে করতে। রোসেনা বাঈ মাথা নিচু করে রইলেন, সারেঙ্গীটি তেমনি কোলের ওপর নিয়ে চুপ করে বসে আছেন ইমতাজ খাঁ—আমি সে বিষণ্ণতার পর্দা ছিন্ন করতে পারলাম না। ইচ্ছে হল কিছু কথা বলি, বলে ঘরের এ স্তব্ধতার জালটা ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু সাহস হল না।

তারপর কখন একসময় দেখি ইমতাজ্ খাঁ আমার পিঠের ওপর হাত রেখেছেন, হাসছেন, বলছেন 'দোস্ত্।' রোসেনা ডাকছেন 'ভাইয়া।' আবার সহজ হয়ে এসেছে ঘরের আবহাওয়া। তখন দু'হাতে সেই বিষণ্ণ জাল ছিঁড়ে ফেলতে আর আমার কষ্ট হল না। তানপুরা তুলে নিয়ে কোনো ভূমিকা না করে, কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে গান ধরে দিলাম আমি। গাইলাম আশার গান, সান্ত্বনার গান। আসবার সময় রোসেনা বাঈ এগিয়ে এলেন সিঁড়ি পর্যন্ত, ইমতাজ খাঁ এলেন, পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, 'আজকের সন্ধ্যেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে দোস্ত্, তোমার মনেও, আমাদের মনেও। ভারী বিষণ্ণ লাগছিল সারা দিনটা—তুমি তা কাটিয়ে দিয়ে গেলে।'

পরদিন সকাল থেকে সেই জানোয়ারটা তার রক্তাক্ত থাবা বসালো মানুষের বুকের মাঝখানটায়। আমরা যে পাড়াটায় ছিলাম সেখান থেকে স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সরে আসতে হল অন্য পাড়ায়। একটা অপ্রত্যাশিত, অনাস্বাদিত যন্ত্রণার মধ্যে ছিটকে পড়লাম কোথা থেকে কোথায়। নিজেকেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে তো ? নিজেকে বাঁচানোর প্রশ্নটা আগে দেখা দিল।

দু'দিন পরে মনে পড়ল তাঁদের কথা—ইমতাজ খাঁ, রোসেনা বাঈ ! কার কাছে বলবো তাঁদের নাম ? ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা, আতঙ্কে আর অবিশ্বাসে ভরে গেছে মানুষের মন। যে বড়লোক ছাত্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার সাহায্যে পুলিশ এস্‌কর্ট নিয়ে যেতে যেতে আরও একদিন দেরি হয়ে গেল।

গলির মুখের দু'ধারের জমায়েত মানুষেরা পুলিশের গাড়ি দেখে অদ্ভুত নিঃশব্দে কাছাকাছি গলিগুলোর মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—কিন্তু মনে হল লুকিয়ে লুকিয়ে এ-কোণ ও-কোণ থেকে আমাকে দেখে ওরা হাসছে বিদ্রূপের হাসি। হয়তো তা আমারই মনের ভুল। ছাত্রটি আমাকে কানে কানে একবার বলেছিল, 'মাস্টারমশাই—যাওয়াটা নিরর্থক। আমি শুনেছি রাজাবাজারের বদ্‌লা ওরা এখানে নিয়েছে……।'

আমি কিছু শুনতে চাই না—চাইলাম না। সেই পরিচিত বাড়িটার সামনে নামলাম। যেন তেমনি একই সঙ্গে সেই যন্ত্রগুলোর সারেগামাপাধানি শুনবো বলে কান পাতলাম, তেমনি ভেজানো দরজা খুলতে গেলাম, দেখি ভাঙা দরজা খোলাই পড়ে আছে—যেন কারা সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এখুনি বলে উঠবে, 'আইএ বাবুজী।'

নিস্তব্ধ ঘর পেরিয়ে অভ্যাসমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। একবার মনে হল যেন রামকেলীর সুর বাজছে কোথায়, আবার সেটা থেমে গেল। বারান্দায় শ্বেতপাথরের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে সেই যুগলমূর্তি তেমনি দাঁড়িয়ে—কেবল রাধার গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, কৃষ্ণের হাতের বাঁশী গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে—অনেকগুলো পায়ের চাপে তা চ্যাপ্‌টা হয়ে গেছে। মেঝেতে এখানে ওখানে শুকনো রক্তের দাগ—যেন লাল গোলাপের শুকনো পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল 'ভাইয়া', কে যেন গম্ভীর গলায় ডাকলে 'দোস্ত্।' কোথা থেকে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর আওয়াজ

ভেসে এল। ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাখোয়াজ আর তানপুরা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ঘরের জাজিম্‌খানা কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে আর অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা পোশাক-আশাক, শাল, জরির নাগরায় বিশ্রী হয়ে। দেওয়ালে লেগেছে রক্তের ছোপ, শুকিয়ে তা এখন কালো হয়ে মিশে আছে। সারা ঘরখানায় একটা বীভৎস, শূন্যতা, একটা আর্ত প্রার্থনা, একটা কান্নার সুর যেন ছড়ানো পড়ে আছে, কারা যেন তাকে পা দিয়ে দলে দলে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সারেঙ্গীটাই কেবল—যেটা ইমতাজ খাঁ নিজে বাজাতেন। কেউ হয়তো অমন বিশ্রী দেখতে যন্ত্রটাকে লাথি মেরে ঘরের একপাশে ছুঁড়ে ফেলেছে। সেটাকে তুলে নিলাম, আঙুলের ছোঁয়া লেগে তাতে সুর বেজে উঠলো রিণ্ রিণ্ করে। মাঝখানের দুটো তার গেছে ছিঁড়ে তবু মনে হচ্ছে সেই সেদিনকার সন্ধ্যেবেলার শেষ সুরটা বেজে বেজে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার তরঙ্গ উঠে আমার বুকের ভেতরকার চাপা কান্নাকে বাইরে টেনে আনছে। ভূতের মতো বসে আছি শূন্য ঘরে।

ঘরের দরজার ছায়া ফেলে কে যেন এসে দাঁড়াল, ডাকল, 'মাস্টার-মশাই।' কারা যেন লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠে আসছে। আমার চারপাশ থেকে সুরটা হঠাৎ থেমে গেল। ছাত্রটি আমার হাত ধরল, 'মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ আটকে থাকার সময় নেই ওঁদের—তাড়া দিচ্ছেন। তাছাড়া টেন্‌সন্‌টা আবার বেড়েছে—ওঁরা যেতে বলছেন।'

চলে এলাম। সিঁড়ির মুখে কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকলে, 'ভাইয়া', কার যেন স্পর্শ পেলাম পিঠের ওপর 'দোস্ত্'—নিচে সেই যন্ত্রগুলো একটানা বাজতে লাগলো সা রে গা মা পা ধা নি, সা রে গা মা পা……

পুলিশ অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী করছিলেন মশাই অতক্ষণ ধরে ? রেখেছে নাকি কাউকে ? যেমন এরা, তেমনি ওরা… উঠুন মশাই উঠুন, আমাদের কি অত সময় আছে। আমার হাতের সারেঙ্গীটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালেন, 'ওটা আবার কি ? জোটালেন কোথা থেকে ? না, না, কোনো জিনিসপত্র এভাবে নেওয়া এ্যালাও করা…।'

আমার সেই বড়লোক প্রভাবশালী ছাত্রটি ফিস্ ফিস্ করে কি বললো তাঁকে কে জানে, বিরক্তমুখে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন অবশেষে।

যারা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল তারা এই শব্দ করে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাশ ফেলে হাসাহাসি করতে করতে লাগল। রক্ত খাওয়া দানবটা কেবল রক্তই খায় না—যাদুও জানে। ওরা দু'পক্ষই সেই রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর হাসছে।

স্ত্রী পুত্রকে নিরাপদ দায়িত্বে রেখে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। সে কথা ভুলতে আমার অনেকদিন লেগেছিল।"

"এই সেই সারেঙ্গী!"—ব'লে পরমযত্নে তাকে একটা কালো কাঠের বাক্সে ভরে রাখলেন নিমাইবাবু।

আমি কেমন অভিভূতের মত বসেছিলাম। আমি তো ব্যবসায়ী মানুষ, নিরেট হিসেব-নিকেশে আমার অবকাশগুলো ভরা। সুর আমার মনে দাগ কাটে না, গান শুনলে আমার অস্বস্তি লাগে। কিন্তু সেই আমারই মনে হতে লাগল ওই কালো বাক্সটার মধ্যে থেকে কী একটা সুর ছড়িয়ে পড়ে সকালের এই প্রসন্ন আলোকে ঢেকে ফেলেছে হঠাৎ। কোথা থেকে একটা বিশ্রী কোলাহল উঠছে, সকালের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে কাদের হাতের লাগানো আগুনে আর তারই মধ্যে কাঁদছে একটা প্রার্থনা, একটা আত্মনিবেদন, একটা শেষমুহূর্তের শূন্যতা।

নিমাইবাবুর সেই মুখটার দিকে আর আমি তাকাতে পারলাম না। নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না এখন কিন্তু ঐ দানবটা যে একদিন আমাকেও গিলেছিল এ কথা নিমাইবাবু জানেন না। এ শহরে উনি নতুন এসেছেন।

সংস্কৃতি ও সমকাল

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কালচার' কথাটা নিয়ে তর্কবিতর্কের খবর অন্তত আমার জানা নেই। এতে বিস্মিত হওয়ার কারণ দেখি না, কারণ আমাদের গদ্যের বয়স যাই হোক, জীবন্ত, ব্যবহারিক গদ্য, যা সামাজিক জীবনের ছন্দে ছন্দিত, তার বয়স নিশ্চয়ই একশ বৎসরের বেশি নয়। এই একশ বৎসরের মধ্যে যে গদ্যের জন্ম ও বৃদ্ধি তার বৈজ্ঞানিক বিচার এখনও হয়নি। অতি আধুনিক গদ্যের গতিপ্রকৃতি দেখে বরং মনে হয়, এখনও অনেক বড়ো পরিবর্তন এর সামনে আছে, যার ফলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বীরবলের গদ্য আগামী একশ বৎসরে প্রায় সেকেলে হয়ে পড়বে। এই ধারণা ভ্রান্ত হলেই খুশি হবো, কারণ শরৎচন্দ্র, বীরবল ও রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গদ্যে বাংলা ভাষা যে রূপ নিয়েছে, তার স্বচ্ছতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ইংরেজী ড্রাইডেন ও অ্যাডিসনের সংগে তুলনীয়। এটাই আশা করব, পরবর্তীকালের গদ্যে মাঝে মাঝে সাময়িক বৈচিত্র্য দেখা দেবে, কিন্তু বাংলা গদ্য ঘুরে ফিরে তার কেন্দ্রীয় স্বভাবেই ফিরে আসবে, যার প্রকৃতি এর মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।

ঐতিহাসিক সূত্রানুসারে যিনি প্রথম বাংলাভাষার অভিধান রচনা করবেন, তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রথম জানব, কবে, কে এবং কোন্ অর্থে প্রথম 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, এবং তারপর কালক্রমে শব্দ দুটির অর্থব্যাপ্তি, সংকোচ বা পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। যতদিন না এ-জাতীয় অভিধান তৈরি হচ্ছে, ততদিন আমাদের আলোচনা কিছুটা অনুমান-নির্ভর এবং দুর্বল হতে বাধ্য। ইংরেজীতে কালচার ও সিভিলিজেশন শব্দ দুটি কম বিভ্রাট সৃষ্টি করেনি। অনেকের কাছে এরা সমার্থক এবং আধুনিক কালেও কেউ কালচার প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাঁকে প্রথমে শব্দটি ব্যাখ্যা করে অগ্রসর হতে হয়—অন্তত সাবধানীরা তাই করেন। বাংলাতেও আমরা বোধ হয় কালচার অর্থে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কথা দুটি ব্যবহার করলেও, এদের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে একদম নিশ্চিত হতে পারিনি। প্রথমটি

সুশ্রব নয়, তাছাড়া কৃষিকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয় বলে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুমোদিত চিৎপ্রকর্ষ শব্দটিও সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে নি, বোধ হয় ওজন ভারী বলেই। বরং ঐ অর্থে সংস্কৃতি কথাটির ব্যবহারই আজকাল ব্যাপক। কৃষির সংগে যোগ আছে বলেই কৃষ্টি কথাটি বর্জনীয়, এটা আমার কাছে সুযুক্তি ঠেকে না, কারণ কালচার কথাটার মধ্যেও ঐ একই ব্যঞ্জনা বর্তমান।

এই আলোচনায় আমরা প্রথমেই ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ ও সামাজিক উৎকর্ষ, এই দুটি ধারণার মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমানা আঁকতে চাই। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলতে আমরা প্রথমটাই বুঝব, দ্বিতীয়টি বোঝাতে আমরা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করব, যেমন সভ্যতা। আমাদের এই সতর্কতার কারণ সম্প্রতি এদেশে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও কালচার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার। বিশেষতঃ রাজনৈতিক বক্তৃতা মঞ্চে।

সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রভেদ বেশ স্পষ্ট—প্রথমটিতে স্বাধীনতার যুক্তি হিসেবে ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বেশি শোনা যায়নি ; দ্বিতীয়টিতে ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিই তার স্বতন্ত্র জাতীয়তার অকাট্য যুক্তি, সুতরাং তার পৃথক বাসভূমির সঙ্গত কারণ। একটু পরেই আমরা দেখব, সংস্কৃতি কথাটির এ প্রসঙ্গে যে-অর্থে ব্যবহার, সে-অর্থ আমাদের নয়, যদিও এ-অর্থেও শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। এখন ভারতে ও পাকিস্তানে জোর জাতীয় ঐক্যের চিন্তাভাবনা চলেছে। যদিও সমস্যাটি দুই দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবু এর সমাধানে দুই দেশের চিন্তায় বেশ মিল দেখা যায়। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে দুই দেশেই চিন্তানায়কেরা জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উপর যথেষ্ট জোর দিচ্ছেন। সংস্কৃতিকে জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট মূর্তিও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এমনি একটা বিগ্রহের ব্যবহারিক মূল্য রাজনৈতিক জীবনে খুব বেশি। কিন্তু পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে রাজনৈতিক মঞ্চে সংস্কৃতির কয়েকটি ভয়ানক ভূমিকা দেখার পর অনেকেরই টনক নড়েছে ; এবং রাজনীতিকেরা এখন যখনই, যে-কোনো দেশেই, কোনো এক সুপ্রভাতে কৃষ্টির পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তখন বুদ্ধিজীবিদের একটু নড়েচড়ে বসা দরকার। দরকার এজন্য নয় যে তাঁরা অনধিকার চর্চা করছেন। কৃষ্টি-চর্চা বা কৃষ্টি-চিন্তা

কোনো শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়, বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকেই কৃষ্টির একমাত্র উপযোগী আবহাওয়া বর্তমান, তা-ও নয়। বুদ্ধিজীবীদের সন্দেহের কারণ অন্যত্র। রাজনীতিক যখন কৃষ্টির কথা বলেন তখন তাঁর চোখের সামনে একটা অদৃশ্য মানচিত্র থাকে—সেখানে জাতীয় কৃষ্টির সীমা-রেখা অত্যন্ত চড়া রঙ্গে আঁকা। আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে বরং মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির সীমানা একেবারেই তর্কাতীত। সংস্কৃতি ততোটা মানুষে মানুষে যোগাযোগের সেতু নয়, যতোটা দেশে দেশে সীমানার প্রাচীর। এবং যেখানেই জাতীয় কৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ, সেখানেই প্রাচীরের ওপারেই দুটি একটি শত্রুপক্ষও বর্তমান। অনেক সময় এই শত্রুপক্ষের উপস্থিতিটিই উৎসাহের আগুনে ইন্ধন। নাৎসী আমলে জার্মানিতে কালচার-চেতনা, ইহুদী-বিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা মিলেমিশে একটা সর্বাত্মক জ্বরের মতো দেশকে পেয়ে বসেছিল, তাই এখন কৃষ্টি ও জাতি এ দুয়ের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পর্কের আভাসেই আমরা শঙ্কিত।

দোষ রাজনীতিকের নয়। কালচার বা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি শব্দগুলির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় ধারণাটি কখনও ব্যষ্টি-প্রসঙ্গে, কখনও সমষ্টি-প্রসঙ্গে আমরা কাজে লাগাই। প্রথম প্রসঙ্গে সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে তা বুঝিনা। অথচ উভয় অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ শুধু বহুল নয়, ন্যায্য। অধুনা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এই দুই শাস্ত্রের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। এবং মানুষের সমাজ ও ইতিহাসচিন্তাও অনেক নতুন পথের খোঁজ পেয়েছে। আজ তাই সহজে কোনো সমাজকেই, তার জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি যতোই আদিম হোক না কেন, কৃষ্টিহীন বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। নৃতাত্ত্বিকের চোখে সাঁওতাল অসভ্য নয়, বরং এক প্রাচীন, অবিমিশ্র ও জীবন্ত কৃষ্টির উত্তরাধিকারী। গ্রীকো রোমান সভ্যতা, বা ভারতীর আর্য সভ্যতা উৎকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সব সমাজকেই এই সব সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে, এ ধারণা আজ অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কৃষ্টিকে বিচার করি, তাতে দোষ নেই, কারণ একটা বিশেষ ও স্পষ্ট অর্থে শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ অর্থে, চিৎপ্রকর্ষের অর্থে যখন আমরা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কথা বলি, তখন সামাজিক কৃষ্টি অবান্তর প্রসঙ্গ না হলেও, ভিন্ন প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই। ব্যক্তির কৃষ্টি একটা উত্তরাধিকার নয়, অবিমিশ্র উত্তরাধিকার তো নয়ই, এটা অর্জনের ব্যাপার, এবং অর্জিত জিনিসটি বা অবস্থাটি যেহেতু একটি সক্রিয় ও

অনুসন্ধিৎসু মনের অবিরাম প্রশ্ন ও প্রয়াসের ফল, তাই তার উৎস, তার জন্মভূমি বহু-বিচিত্র। আমাদের সংস্কৃতজন বা বিদগ্ধজন তাই মানসিক গঠনে প্রায়ই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বনাগরিক (cosmopolitan)।

যখন কৃষ্টি এই দ্বিতীয় অর্থে সীমিত, তখন সে ব্যাপারে রাজনীতিকের উৎসাহ ক্ষীণ। শুধু রাজনীতিক কেন, সমাজের একটা বড়ো অংশ এই বায়বীয় ও উন্নাসিক জিনিসটি নিয়ে মাতামাতি করা সন্দেহের চোখে দেখবে। এই বিশেষ অংশ কৃষ্টিহীন বলে নয়, কৃষ্টিকে তাঁরা সমগ্র জীবনের প্রেক্ষিতে অনত্যাবশ্যক ও প্রান্তিক বলে ভাবেন, তাই। খ্রীষ্টধর্মের পিউরিটান সংস্করণের যে সব দেশে প্রতিপত্তি সেখানে, এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ সম্বন্ধেই কথাটা বোধ হয় খাটে। ধর্মীয় প্রভাবের ফলে এসব দেশে জীবন সম্বন্ধে একটা গভীর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে! রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বা হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম আচার ও অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পিউরিটান ও মুসলিম সমাজ অধিকাংশ শিল্পকর্ম সম্বন্ধে হয় নিরুৎসাহ, নয় বিরুদ্ধবাদী। এই পরিবেশ সর্বদা শিল্পচর্চার অনুকূল নয়। এবং যদিও শিল্প ও সংস্কৃতি সমার্থক নয়, তবু শিল্প ও মননই সংস্কৃতির দুটি প্রধান উপজীব্য; তাছাড়া দুটি ক্রিয়া প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মনন-বর্জিত শিল্পী ও সৌন্দর্য-বোধহীন মনস্বী প্রায় আজগুবী ব্যাপার। এটা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয় যে পিউরিটান দেশগুলিতে, দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম সমাজে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, বা মহৎ শিল্পীর নজীর নেই। ইতিহাস বরং বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। প্রত্যেকটি পিউরিটান দেশে, বা প্রতিটি মুসলিম সমাজেই ইতিহাসের কোনো না কোনো যুগে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব নয়, যখন সভ্যতা শীর্ষগামী। আসলে আমি যে প্রভেদটি টানতে চাচ্ছি সেটা, সৃষ্টির, দৃষ্টির। একজন মামুলী মানুষ শিল্প-সাহিত্যকে কি চোখে দেখে, তার প্রভেদ। এবং এই প্রভেদটি যদি নেহাৎ কাল্পনিক না হয়, তাহলে আমরা খানিকটা বুঝতে পারব, কেন রাজনীতিক, যিনি জাতীয় সংস্কৃতির কীর্তনে পঞ্চমুখ, ব্যক্তিসংস্কৃতির ব্যাপারে অনাগ্রহী। রাজনীতিক যদি এই সংস্কৃতিতে অনুৎসাহী হন, তবে সেটা তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন বলেও নয়, তিনি একটা বিশেষ সমাজমনের ভাগী বলে। তাঁর অনিচ্ছা, তাঁর অনাগ্রহ সম্পূর্ণ তাঁর নিজের নয়, অনেকখানিই তাঁর সমাজমনের। এবং এই অনাগ্রহ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বোধ হয় সচেতন নন।

তাই বলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রসঙ্গে রাজনীতিকের উৎসাহ অযৌক্তিক বা মেকী এটাও প্রমাণ হয় না। তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ হতে পারে, তাঁর সহানুভূতির ক্ষেত্র ছোট হতে পারে, হতে পারে তাঁর দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়। এতে আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু আপত্তির কারণ ঘটে তখনই, যখন জাতীয় সংস্কৃতিকে একটা অবিচল ও অজটিল কিছু বলে চালানোর চেষ্টা হয়। যেন একটা কিছু যা একেবারেই তৈরী এবং চিরকালের জন্য। আর জাতির দায়িত্ব যেন সেই মূল্যবান বস্তুটির খবরদারি করা। তাকে নষ্ট হতে না দেওয়া, তাকে বিজাতীয় সম্পর্ক থেকে সরিয়ে রাখা।

এখানেই ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাজনীতিকের বিরোধ। ইতিহাস বলবে. দু-চারটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা অরণ্যে বা উপত্যকায় দু-চারটি আপাতস্থির ও অবিকৃত কৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব। এর বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তর জনসমাজে কালস্রোত তার ভাঙাগড়ার চিহ্ন রেখে গেছে; সভ্যতার জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ঘটেছে; এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো সমাজ তার দুর্মর প্রাণশক্তির জোরে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শুধু টিকে আছে নয়, সভ্যতার আলোও জ্বালিয়ে রেখেছে। সমাজতত্ত্ব বলবে আজকের পৃথিবীতে কোনো সমাজই আভ্যন্তরীণ গঠনে সরল নয়, প্রতিটি সমাজই শ্রেণীবিন্যস্ত; এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গরীবের কৃষ্টি মধ্যবিত্তের কৃষ্টি নয় বা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কৃষ্টিও এক নয়। একই সমাজের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীগত কৃষ্টি। ব্যাপক অর্থে কৃষ্টি বলতে যদি একটা সমাজের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বুঝি, তাহলে সমাজতত্ত্বের এই সত্যকে মেনে নিতে হয়। বাংলাদেশের গ্রামে যে কৃষক বা জেলে সন্ধ্যাবেলা পাশের গ্রামে যাত্রা দেখার জন্যে অনেকখানি কাদামাটির পথ ভাঙে, তার সাথে শহরের সিনেমা-পাগল, ফুটবলমত্ত মানুষটির মিল কোথায়? এবং শেষোক্ত ব্যক্তিটি যদি হঠাৎ বড়ো শহরের বড়ো ক্লাবের বিদেশী তামাশার মাঝখানে গিয়ে পড়ে, তাহলে সেও ঠিক স্বজন-সান্নিধ্য-রসে সিক্ত হয়ে ফিরবে না। কৃষ্টির এ-ও একটা সংজ্ঞা হতে পারে: কৃষ্টি আমাদের অবসরের জীবন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে একই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র কৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়।

অবশ্য এই বিভিন্নতা যে দ্বন্দ্বমূলক হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই, বিশেষ করে যেসব সমাজের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে একটা সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে। সমাজের বিভিন্ন অঙ্গে যতই বৈচিত্র্য থাক, একটা ঐক্যের সম্পর্কও গড়ে দিয়েছে

এই ধর্মীয় একাত্মতা। আবার এ-ও সত্য যে সম্ভাব্য ঐক্যকে সম্পূর্ণ হতে দিচ্ছে না ধনবন্টনের অসাম্য। তাই সর্বাত্মক ঐক্যের মধ্যেও খানিকটা বিরোধ, খানিকটা বিভিন্নতা থেকেই যাচ্ছে। এবং এই বিরোধ ও বিভিন্নতা প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিটি শ্রেণীর আপন আপন কৃষ্টিতে।

ম্যাথু আর্নল্ডের চিন্তায় এইখানেই একটা গোলমাল দেখা যায়। সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে, বা বিশেষ করে স্বদেশের সমাজে খ্রীষ্টধর্মকে, তাঁর মনে হয়েছিল মৃতশক্তি। আবার সমাজের তিনটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে চরিত্রগত গরমিল বিশ্লেষণ করেও, কৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনি সমাজতাত্ত্বিকের বিচার দেখাতে পারেন নি, বা প্রতিটি শ্রেণীর চরিত্র বা প্রবণতা বোঝেন নি। কৃষ্টি বলতে তিনি ব্যক্তির 'চিৎপ্রকর্ষ'ই বুঝেছেন। তাঁর বিদগ্ধ মানুষগুলি তাই অন্ধকার আকাশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তারা। এবং তাঁর বিবেচনায় মানুষের কৃষ্টি ধর্মের বিকল্প।

অবশ্য আর্নল্ডের মূল প্রস্তাব মেনে নিলে, তাঁর সংস্কৃতির সংজ্ঞা স্বীকার করে নিলে, তাঁর সিদ্ধান্তটা মেনে নেওয়াও সম্ভব। কিন্তু তাঁর চিন্তায় সমাজ সম্বন্ধে হতাশা আজ অনেকের কাছে অনর্থক নৈরাশ্যবিলাস বলে মনে হবে। তাছাড়া, কোনো সমাজের শ্রেণী-বিন্যাসই চূড়ান্ত নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ক্রমাগত এটাকে ভাঙাগড়ার ছন্দে নাচাচ্ছে, এবং প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যেও চরিত্রগত বদল ঘটছে, বিস্ময়কর ভাবে ঘটছে—এ সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। গণ-সংস্কৃতি কথাটা তাঁর সময় অতোটা চালু হয়নি, এবং বেঁচে থাকলে আজ এই সংস্কৃতিকে তিনি যে সুলক্ষণ বলে ভাবতেন না, তাও পরিষ্কার।

ম্যানহাইম নির্দেশিত পথে এলিয়টের চিন্তা তাই আর্নল্ডের যুক্তি খণ্ডাতে ব্যস্ত। শুধু সমাজের চঞ্চলতা নয়, সমাজ-মধ্যস্থ প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে চঞ্চলতা তাঁর কাছে পরম সত্য। ঠিক তেমনি সত্য প্রতিটি পেশার ও শ্রেণীর আপন আপন কৃষ্টি। ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ শ্রেণী-কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নয়, আত্মস্থ করে। এলিয়টের উত্তম শ্রেণী, যাকে তিনি ইলিয়াইট বলেছেন, সমাজের বিভিন্ন 'বর্ণের' প্রতিনিধিস্থানীয়। তাই বলে এই শ্রেণী-সংস্কৃতি তুলনীয় অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে একেবারে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এলিয়টের বিদগ্ধজন অপরাপর শ্রেণী ও পেশার ধর্ম ও মর্ম সম্বন্ধে কুতুহলী, এবং সর্ব-শ্রেণীর উত্তমজনের সমবায়েই তাঁর উত্তম সমাজ। অবশ্য এটা অনেকটা আদর্শ প্রস্তাবের মতো শোনায়, না

হলে হালে সি. পি. স্নো-র 'দুই সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে এত ধুলো উড়তো না। সমাজের সুশিক্ষিত স্তরেই যদি 'দুই সংস্কৃতি' সত্য হয়, তাহলে বৃহত্তর সমাজে বহু সংস্কৃতির অস্তিত্বও বা অসম্ভব কেমন করে? কিন্তু এলিয়ট এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন এই ভাবে যে তাঁর ধারণায় যে কোনো সমাজের সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদই হল সাধারণ ধর্ম। তাই শ্রেণী-সংস্কৃতি যেন অনেকটা উপ-সংস্কৃতি—মৌলিক ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য।

ক্লাইভ বেলের সংগে এলিয়টের মিল এইখানে যে যদিও তাঁরা দুই-জনেই ব্যক্তিগত চিৎপ্রকর্ষের কথা বলেন, তবু এটাকে সম্পূর্ণ সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যাপার মনে করেন না। বরং বিপরীত। সামাজিক উৎকর্ষের উপর ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ যেন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। উপরন্তু বেলের উত্তমজনের জন্য সমাজকে রীতিমতো মূল্য দিতে হয়, একটা আলাদা শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হয় যা শ্রমব্যবস্থার শিকলে বাধা নয়—অবসরভোগী। এইখানেই এলিয়ট ও বেলের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বড়ো তফাৎ। বেলের সংস্কৃতি অনেকখানি শৌখিন, একটা অতি সচ্ছল শ্রেণীর অবসরের অনিশ্চিত ফসল। আর এলিয়টের সংস্কৃতি শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের সামগ্রিক ফসল—এ কোনো বিশেষ আবহাওয়ার আনুকূল্যের আশা করে না। বেলের বিদগ্ধজন একটা বিশেষ সমাজের সৃষ্টি হলেও তার আনুগত্য সমাজের কাছে তো নয়ই, দেশের কাছেও নয়। সে বিশ্বনাগরিক—কজমোপলিটান। জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় আদর্শ যখন তার সংস্কৃতির সাথে বিরোধ ঘটায়—এবং তার কাছে সংস্কৃতি ও সত্য সমার্থক—তখন সে সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরে, তথাকথিত দেশদ্রোহিতার ঝুঁকি নিয়েও। তার ব্যক্তিগত বিচারের স্থান সামাজিক সিদ্ধান্তের অনেক উপরে, এবং শেষোক্ত বস্তুটি বড়োজোর একটা অনির্দিষ্ট ধারণা, একটা ফাঁকা বুলি, একটা জনশ্রুতি যা বারবার উত্তরকালের বিচারে ধিক্কৃত হয়েছে। এলিয়ট এমন কোনো বিরোধের কথা ভেবে অযথা চিন্তিত নন, যদিও এমনও নয় যে এর সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু বেল যেখানে মূলত নৈরাজ্যবাদী এলিয়ট যে-কোন্ মূলত সমাজ-শৃংখলায় বিশ্বাসী। উত্তমজনের জন্য কোনো অতিরিক্ত স্বাধীনতা তিনি চান নি।

সংস্কৃতি প্রসংগে আলোচনায় বেল ও এলিয়টের চিন্তার মধ্যে এই তফাৎটা ইংগিতপূর্ণ। এবং বর্তমান কালে বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎস ও প্রতিপত্তি যেসব দেশে সেখানেও

সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ক্রমেই শক্তি অর্জন করছে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। সুতরাং যে সংস্কৃতি মানুষকে প্রথমত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা শেখায়, তাকে খর্ব করছে নতুন নতুন বাধা নিষেধ। যেখানেই সংঘাত বাধছে ব্যক্তির দাবি ও সমাজের দাবির মধ্যে, সেখানে ব্যক্তিকে হঠ্‌তে হচ্ছে সমাজকে ঠাঁই করে দেবার জন্য। অনেকে বলবেন ব্যক্তি ও সমাজের দাবির মধ্যে এই বিরোধ সম্পূর্ণ কৃত্রিম বা কাল্পনিক। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তা মনে হয় না। যদি মানতেও হয় যে বৃহত্তর সমাজের যাতে কল্যাণ, ব্যক্তির কল্যাণও তারই মধ্যে, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ কিসে, তার অমোঘ ও অভ্রান্ত বিচার সম্ভব কিনা। সবচেয়ে বড়ো কথা, ব্যক্তি যদি নিজেকে ব্যাহত মনে করে, সেই মনে করাকে কতটুকু মূল্য দেব। ব্যক্তি যদি সমাজের ইচ্ছার (এ হেন বস্তুর অস্তিত্ব যদি থাকেও) সঙ্গে নিজের ইচ্ছার মিল ঘটাতে না পারে, তবে তার চিন্তার ও কর্মের কতটুকু স্বাধীনতা সমাজ দেবে? আর এই সমস্যার জন্ম যখন প্রধানত জ্ঞানী ও গুণীরাই দেবেন তখন সমাজতান্ত্রিক, এমনকি গণতান্ত্রিক দেশেও তাঁদের ভূমিকা কি? নিছক বিরুদ্ধতার? না অক্ষম সংখ্যালঘু বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার? না গঠনমূলক, আত্মসচেতন, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও আপোসহীন দ্বন্দ্বের?

এ প্রশ্নের কোনো সহজ জবাব নেই। কারণ বিদগ্ধজন প্রতিরোধের সামনে বা প্রতিকূল পরিবেশে কি করবেন, তা তিনিই জানেন। এবং এঁরা সবাই যে মিলিত হয়ে সভা করে একই কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, তারও নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রশ্নটি সমাজের দিকেই ঠেলে দেওয়া যায়। সমাজ এঁদেরকে ফাঁকা মর্যাদা দিয়ে কার্যত অক্ষম করে রাখতে পারে অথবা এঁদেরকে একেবারে উপেক্ষা করে নিম্নস্তরের বুদ্ধিজীবীদেরকে সম্মান দিয়ে সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে এঁদেরকে অস্বীকার করে অন্তত শান্তি ও শৃঙ্খলার দুশমন একদল বিকৃতবুদ্ধি উৎকেন্দ্রিক লোক হিসেবে এক ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। এবং এ ধরনের রায় দিতে সমাজ পাতি-বিদগ্ধ শ্রেণীর সরব সমর্থন পাবে। এই সমাজ-সচেতন ও দায়িত্বশীল শ্রেণী 'সরকারী বুদ্ধিজীবী'র গদি উজ্জ্বল করবেন, এবং এঁরা সর্বদাই সুস্থবুদ্ধির মানুষ হবেন, আর বৃহত্তর ও মহত্তর সামাজিক মঙ্গল চিন্তায় এঁরা অষ্টপ্রহর অস্থির থাকবেন। এঁদের প্রতিপত্তি

ও শ্রীবৃদ্ধিই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবে সরকার বা সমাজ কতখানি কৃষ্টি-সচেতন। ফলে এমন অবস্থা অসম্ভব নয় যে যাঁরা ব্যক্তিগত সংস্কৃতির নির্দেশে চিন্তাভাবনায় থাকবেন সংখ্যাগুরু চিন্তার বিপক্ষে তাঁদের ভাগ্যে জুটবে বিড়ম্বনা। রাসেলের মতো মনীষিকেও আদালতে কাজীর ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে, তাঁর দায়িত্ব-হীনতার জন্য।

আমার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে সমাজ সর্বদাই অত্যাচারী বা মূঢ় বা অসহিষ্ণু। এটাও মেনে নিতে বাধা নেই যে কোনো সমাজই কখনই এতখানি সভ্য নয় যে সক্রেটিসেরা কোনোদিনই বিপন্ন হবেন না। কিন্তু এটাও আমার প্রতিপাদ্য নয়। বরং আমি মনে করি, একনায়কতন্ত্রের বাইরে যে-কোনো সমাজেই যথেষ্ট মূঢ়তার সংগে বিস্তর শুভবুদ্ধি আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে। ঋষিরা কালেভদ্রে লাঞ্ছিত হন বলে যারা জেলখানায় অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে, তারা সবাই ঋষি নয়। আমার বিবেচনার বিষয় সংস্কৃতি। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কৃতি সামাজিক সভ্যতার অনুকূল আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে, তবু প্রায়শঃই ব্যক্তিগত সংস্কৃতি মানুষকে সমাজের স্বাভাবিক গতির উল্টোপথে ছোটায়। যদিও পরিণামে এই বিরুদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষেই কল্যাণসূচক, কিন্তু আপাতত ব্যক্তির সাথে সমাজের এই দ্বন্দ্ব একটা সামাজিক সত্য। অনেক সমাজ এইখানে বিস্তর সকৌতুক সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের ধৈর্য বা কৌতুকবোধ অতটা পুষ্ট নয় বলে এসব উৎকেন্দ্রিকতার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

বর্তমান যুগের এই একটা মস্ত হেঁয়ালী যে ইতিহাসে কখনও এমন ব্যাপক ও সুপরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতির প্রতি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায়নি। অথচ, এই পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, যাঁরা সত্যকার গুণী ও বিদগ্ধজন, যাঁরা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাঁদের সাথে রাষ্ট্রের আজই সবচেয়ে বেশি আড়াআড়ি। কারণ বোধ হয় এই যে রাষ্ট্র সংগঠনের প্রতীক, সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্যের। লক্ষণীয় এই যে যেসব দেশে গণতন্ত্র পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এই বিরোধ অন্তঃশীল হলেও, যেখানে শাসনপদ্ধতি আলাদা, যেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নি বা কোনোদিন হলেও রকমারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের হাতে মার খেয়ে গণতন্ত্র যেখানে মৃত বা মুমূর্ষু, সে সমস্ত দেশে এই বিরোধ প্রায়ই প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। এবং এর ফলও অবধারিত। বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রশক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খান, এঁদের মধ্যে একদল আপোস করেন বা নিজেদের বিকিয়ে

দেন। এঁদের মধ্যে একদল আপোস করেন বা নিজেদের বিকিয়ে দেন। এঁদের শ্রীবৃদ্ধির কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধি কৃষ্টির জয় সূচনা করে না। রাষ্ট্রশক্তি যখন সরবে কৃষ্টির মুরুব্বিতা করে, তখন হয় 'জাতীয় কৃষ্টি'র জন্য করে, যার একটা সরকারী সংজ্ঞা আছে, বা জাতীয় 'গৌরবে'র জন্য করে, যার পিছনে প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা সক্রিয় থাকে। এখানে কৃষ্টিকে সরকারী প্রচারের সেবাদাসীর ভূমিকায় দেখা যায়। ফলে যাঁরা সত্যকার 'প্রকৃষ্টজন' তাঁরা এই কৃষ্টির হাট থেকে সরে থাকেন।

এই প্রচার জিনিসটা অতি আধুনিক না হলেও, খুব পুরনো নয়। বর্তমান কালেই রাষ্ট্রশক্তির আদরে লালিত হয়ে এটা একটা পোষা দৈত্য হিসেবে সব দেশেই সমাদৃত। এই দৈত্যের কাছে রাষ্ট্রের আশা অনেক। কিন্তু এ যখন প্রবল আগ্রহে সংস্কৃতিকে বুকে চেপে ধরে, তখন বেচারীর দেহটি সেই আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লেও, প্রাণটি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে।

রাষ্ট্রের সাথে বিদগ্ধ সমাজের অসঙ্গতির উৎস এখানেই। কৃষ্টি যাঁর মনোমণ্ডলের বাতাসের মতো, তিনি কোনো অবস্থাতেই কতকগুলি ক্ষেত্রে আপোস করতে পারেন না। রাষ্ট্রশক্তি ব্যস্ত থাকে ক্ষমতা অর্জনে, সংরক্ষণে ও বিস্তারে, প্রকৃষ্টজন মগ্ন থাকেন সত্য ও সুন্দরের চর্চায়। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ক্ষমতার গর্বে, গরজে ও তাগিদে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সর্বদা সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না, অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে সমাজের সামনে উপস্থিত করতে হয়; এবং মাঝে মাঝে এই কর্মে সমাজের সম্মতিও প্রয়োজন। সমাজের বৃহত্তর অংশের অন্তত মৌন সম্মতিটুকু পাওয়া আজকাল রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ না হলেও, সম্ভব; কিন্তু বাধা পেতে হয় সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের কাছ থেকে যাঁরা সহজে বিভ্রান্ত হন না, যাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনলস চর্চায় শানিত, যাঁদের কাছে সরকারী প্রচারনা প্রায়ই প্রতারণার মুখোশ। প্রতিটি সমাজেই এই সুসংস্কৃত শ্রেণী তার সজাগ চক্ষুর মতো জেগে থাকে।

সমস্ত পৃথিবীতে আজ বিদগ্ধজনের পরিস্থিতি এক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা বাদ দিলেও; প্রতিটি দেশের ঘরোয়া রাজনীতিও ক্ষমতা দখলের নির্মম প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে এই একই খেলার রকমারী সংস্করণ প্রচলিত। এই পরিবেশে বুদ্ধিজীবীর পক্ষে স্বধর্ম রক্ষা করে চলা

কঠিন। তাঁকে শুধু যে রাষ্ট্রশক্তির সাথেই বোঝাপড়া করতে হচ্ছে, তাই নয়, মধ্যম ও অধমের সাথেও তাঁর প্রতিযোগিতা। কারণ শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে ক্রমেই 'গণ-সংস্কৃতি'র সমাদর বাড়ছে—জনসাধারণের উপযোগী করে এ জিনিসটার উৎপাদন রাষ্ট্রের নির্দেশে না হলেও, রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ও আশীর্বাদে। স্কুলে, কলেজে, সিনেমায়, বই-এর বাজারে পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র আজ এই গণ-সংস্কৃতি গদীনশীন। এর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকে চিনে নিতে হলে যে রুচি ও মনস্বিতার প্রয়োজন, যে বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন, তার উপযোগী আবহাওয়া আজ দুর্লভ।

চিন্তার কথা এই যে আজকাল অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা, ও মোটামুটি শিক্ষার বহুল প্রসার, শতলক্ষ বই-এর বিক্রি ও শতসহস্র ডিগ্রিধারী যুবক-যুবতীর কথা ভেবে একটা সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান: এতদিনকার গণ্ডীবদ্ধ সংস্কৃতি এখন আপামর জনসাধারণের আয়ত্ত, সংস্কৃতির আজ পরম সুদিন।

কিন্তু সাধারণ অর্থে উন্নতি ও আমাদের অর্থে সংস্কৃতি এক কথা নয়, এবং দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ নির্ণয় করা মুশকিল। কাজেই যদি ক্লাইভ বেল ও অপরাপর বহু পণ্ডিতের একমত হতে হয় যে সভ্যতার যে স্তরে পেরিক্লিসের অ্যাথেন্স উঠেছিল, অদ্যাবধি পৃথিবীর আর কোনো সমাজ সেখানে পৌঁছতে পারেনি, যদিও শক্তি, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের বিচারে এরা অনেকেই সে যুগ ও সেই সমাজকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে—তাহলে তথাকথিত উন্নতির সমস্ত লক্ষণ সত্ত্বেও নৈরাশ্যের কারণও আছে অনেক।

বিশেষ করে এই বিংশ শতকে। গত শতাব্দীতে য়ুরোপীয় জগতে পৃথিবীর মানুষের জন্য আশা ছিল অত্যুচ্চ। সেটা সাম্রাজ্যবাদী স্থিতি, সমৃদ্ধি ও সন্তুষ্টির যুগ, বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ, গণতন্ত্রের প্রসারের যুগ। কিন্তু এ শতকে, দুটি মহাযুদ্ধের পর, এবং গণতন্ত্রের পরাজয়ের অনেকগুলি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এ আশা আর সুলভ নয় যে উন্নতি অনিবার্য ও অবধারিত; ইতিহাসের ধারা স্বভাবতই অগ্রমুখী।

কোনো নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নতির সমীকরণ অবৈজ্ঞানিক। তবু এ নিয়ে বেশি মতান্তর নেই যে সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ হলো

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তাই প্রতিটি দেশেই, যেখানে গণতন্ত্রের অন্তত একটুখানি মৌখিক সমাদর আছে, সেখানে সংস্কৃতির সংজ্ঞা পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

প্রথমত, রাজনীতিকেরা যে জাতীয় সংস্কৃতির কথা বলেন, সেটা আমাদের অর্থে সংস্কৃতি নয়, সেটা নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অর্থে সংস্কৃতি। এই অর্থে আমরা সভ্যতা কথাটি ব্যবহার করেছি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর-সম্পর্কহীন নয়, কিন্তু সমার্থকও নয়। অসংস্কৃত ব্যক্তির চেতনায় সভ্যতার অস্তিত্ব নেই, সভ্যতার উপলব্ধির জন্য সংস্কৃতির প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে যাদুঘরে সভ্যতার কায়া, তার আত্মা প্রকৃষ্টজনের মনে, বিদগ্ধজনের চেতনায়। তাই যে দেশে বিদগ্ধ সমাজ নেই, প্রকৃত অর্থে তার সভ্যতাও নেই, কারণ সে সভ্যতার উপলব্ধি নেই।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি জন্মসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নয়, অর্জিত সম্পদ। কোনো বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পদ নয়। উপযুক্ত গুণ, মেধা ও চর্চার সমন্বয় যাঁর মধ্যে, তাঁরই আয়ত্ত।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী না হলেও, সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয়তাবোধের নির্মম শত্রু। রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধটা বাহ্য, আন্তরিক নয়, কারণ শুভবুদ্ধির উপর যে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা, তা সমালোচনার ভয়ে অযথা ত্রস্ত নয়; বরং সমালোচনার মূল্যে আস্থাশীল, অতএব শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ বন্ধু না হলেও, এদের সম্বন্ধে অন্তত শ্রদ্ধাশীল।

চতুর্থত, সংস্কৃতি সংগঠনে উৎসাহী নয়। এবং বর্তমান যুগের হুজুগ যে সব প্রতিষ্ঠানিক কৃষ্টি-কেন্দ্র, এদের প্রাথমিক আদর্শ যাই হোক, প্রায় অনিবার্য নিয়মেই এদের গণ্ডীতে কৃষ্টির ও প্রকৃষ্টজনের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। সুতরাং একটু তাকিয়ে দেখলে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-বৃদ্ধিকে কৃষ্টির বিস্তার বলে মনে করা অসমীচীন। প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা অধোগতির দিকে। এবং এই অধোগতির সঙ্গে বর্তমান যুগের ছাঁচে-ঢালাই য়ুনিফর্মিটির প্রতি মোহ অনেকখানি সম্পর্কিত। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ম যত সহজে চেনে, ব্যতিক্রম তত সহজে চেনে না, মাঝারিকে যতটা বোঝে, প্রতিভাকে তা নয়। তাই এদের প্রভাব যতই সর্বাত্মক হচ্ছে, ততই দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করার চেষ্টাও বেড়ে চলেছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের

ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে না। সংস্কৃতির বিচারে এরা মৃত, কারণ এরা সৃষ্টিধর্মী নয়।

এবং সবশেষে সমাজের প্রতি বিদগ্ধ-শ্রেণীর দায়িত্ব। আগেই বলেছি যে, সংস্কৃতির ধর্মই হলো ব্যক্তিগত সত্যবোধকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। এবং আমাদের বিদগ্ধজন এই একটি ক্ষেত্রে কোন আপোস করেন না। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের প্রতি আনুগত্যে যেহেতু তিনি অবিচলিত, এবং এ-দুটি আদর্শকে কোনো কোনো সমাজ কোনো কোনো সময় ভুললেও কোনো সমাজই চিরকালের জন্য বর্জন করে না, সুতরাং শেষ বিচারে এঁরাই সমাজের প্রতি সর্বোচ্চ দায়িত্বের পরিচয় দেন। এঁদের শ্রেণীগত দুর্বলতা হলো এই যে সমাজ-সেবক ও খাদেমে কওমদের দলে কখনোই, বোধ হয় আলস্যবশতই, নাম লেখান না। *

---

* রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

অরুণা হালদার

পরদিন ১৩ই জানুয়ারি (১৯৬২), আমার লেনিনগ্রাদ যাবার কথা। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ে বসতেই শ্রীযুক্তা বীকভা এলেন, তাঁর চালনায় নিচে গিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে এলাম। শ্রীতীমকিয়েফ মহাশয়ও ততক্ষণে এসে গেলেন। আমরা ৯॥০ টায় তৈরি হয়ে বেরুব। এসব হোটেলে টিপ্‌স বা বখশিস্ দেবার নিয়ম আছে কিনা জানি না। সহসা দিতে ভরসাও হয় না— পাছে মানুষকে অপমান করে ফেলি কোথাও। জিজ্ঞাসা করে জানলাম— "কেউ কেউ দেয়, কেউ কেউ নেয়।" নানা কথা ভেবে আমি শেষ পর্যন্ত আমার পুঁজি বার করলাম—গিরিশের 'কড়াপাক', বেশ ম্যাগনাম সাইজের। তাতে করে আমার ভাগে কম পড়লেও যেরূপ আনন্দকর পরিবেশের তখন সৃষ্টি হলো যে, তা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। ভাবলাম যারা এটম বোমা বানায়, তারা তা বানাক ; আমরা না হয় সন্দেশই বানাব। তাতে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়। জিনিসপত্রের সঙ্গে কিন্তু লক্ষ্য করলাম, প্লেনের প্রেসারেই সম্ভবত, আমার দিল্লীতে ১০ তারিখে কেনা বড়ো একটা ঔষধের বোতল কোথাও ফেটে গিয়ে ওষুধ ধীরে ধীরে বার হয়ে যাচ্ছে। এ ওষুধ বিদেশে দুর্লভ। তবুও ক্ষুণ্ণ মনে তা ফেলে আসতে হলো। পরে দেখেছি কিছু ক্রীমের বোতলও ঐরূপ কোনো কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমার সঙ্গে ৭৫৲ টাকার ভারতীয় নোট ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোনো এক্‌সচেঞ্জ ব্যবস্থাও আমার লাভ হয় নি। এজন্য এখানকার কর্তৃপক্ষ আমায় ৫০ রুবল অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করলেন তখনই।

যাত্রার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই যথারীতি আবার হোটেলের ভেস্টিব্যুলে গেলাম। সেখান থেকে পাশের ঘরে গিয়ে আমার পাসপোর্ট ইত্যাদি ছাড়িয়ে নিতে হলো। ফিরে এসে কোট পরিধান করে জিনিসপত্র সমেত ট্যাক্‌সিতে উঠলাম। এবার দিনের আলোতে মোটর ছুটল মস্কো এয়ারপোর্টের দিকে। মস্কোতে দুটি এয়ার স্টেশন আছে—একটি আন্তর্জাতিক এয়ারস্টেশন ; অন্যটি

আভ্যন্তরীণ—সোভিয়েত দেশের আভ্যন্তরীণ স্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য। দুই পৃথক এলেকায় দুই স্টেশন। পথ দীর্ঘ। দুপাশে সারি সারি বার্চ গাছ। অবশ্য কোনো গাছেই এখন পাতার বালাই নেই। গাছের বিবর্ণ গুড়িগুলি প্রোথিত রয়েছে কেবল সাদা ঘনস্তূপ বরফের তরঙ্গে। রাশি রাশি মেঘের সমুদ্র যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। শুনলাম বরফ এ দেশের লোক এতো ভালোবাসে যে বিদেশে গিয়েও তার মায়া কাটাতে পারে না। দেখতে দেখতে যাচ্ছি— ঘরের ছাদে, জানালার কার্নিসে, গাছের ডালে, সর্বত্র বরফ জমা। মস্কো নগরী ছাড়িয়ে যত উপকণ্ঠের দিকে এগুতে লাগলাম গ্রামীণ জীবনের আভাস ততই কিছুটা পেতে লাগলাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি বরফের মধ্যে যেন মাথা গুঁজে আছে। তার পায়ে বরফ, গায়ে বরফ, মাথায় বরফ—চতুষ্পার্শ্বে তাই।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছুলাম তখন আমার প্লেন ছাড়তে মাত্র দু-মিনিট বাকি। তার মধ্যে আর আমার জিনিসপত্র তোলা সম্ভব নয়। অতএব, তীরে এসে তরী ডুবল। সাড়ে দশটার প্লেনে যাওয়া হলো না। পরের প্লেন দেড়টাতে। তাতেই যাবার ব্যবস্থা হলো। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সময়-জ্ঞান নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগলাম। দেশে সর্বদাই আমার স্বামীর কাছে আমার লটবহর নিয়ে চলার জন্য ও অনেকখানি সময় হাতে না নিয়ে বেরুবার জন্য আমি বহুবার বকুনি খেয়েছি। এবার কিন্তু বকুনিটা (অনুচ্চারিত হলেও) আমার একার প্রাপ্য নয়। আপাতত ইন্‌টুরিস্ট ঘরে এসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইনটুরিস্ট হচ্ছে সোভিয়েত দেশের মধ্যে ভ্রমণ ব্যবস্থার সংস্থা, হোটেলে, স্টেশনে সর্বত্র তার শাখা আছে। অবশেষে আবার প্লেন এলো, যে বড়ো বিমানে এদেশে এসেছি এ প্লেন তার চেয়ে ছোট আকারের। তবে এও জেট। সে প্লেনে জিনিসপত্র চড়ানো হলো। এখানে অত বেশি কড়াকড়ি নেই ; তাই শ্রীযুক্ত তীমফিয়েফ ও বীকভা প্লেনের একেবারে কাছে এলেন। প্লেনে ওঠার আগে বরফে পা পিছলে বেশ ভালোভাবে আছাড় খেতে খেতে আমি সামলে নিলাম। আঘাত পেলাম না বটে, কিন্তু নিজের তখন মনের ব্যথাটা দেহের ব্যথার থেকে কম নয়—শাড়িটায় বেশ কাদা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পুরনো ভয়ও জাগল। এইতো বিমান, সেই আবার মাথা ঘুরবে, নিঃশ্বাস নিতে পারব না। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে প্লেনে উঠলাম। প্লেনও ছাড়ল। এবারও প্লেনে কান ব্যথা করতে লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত আর অতটা কষ্ট হলো না। প্লেনে লোক কম। এ প্লেনও যথেষ্ট ওপরে

ওঠে। ঘণ্টাখানেক পথ অতিক্রম করে তিনটা নাগাদ লেনিনগ্রাদে এয়ার-স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

লেনিনগ্রাদে মস্কো থেকেই বীকভা যে তার পাঠিয়েছিলেন সেই তার অনুসারে যাঁরা আমায় নিতে আসার কথা তাঁরা আগের প্লেনটিতেই আমার খোঁজ করবেন। সুতরাং মস্কো থেকে আবার একবার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করা হয়েছে। বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার জন্য প্লেন লেনিনগ্রাদের এয়ারপোর্টে নামতেও দেরি করল। প্রায়ান্ধকার বিষণ্ণ ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে প্লেন অবশেষে নামল লেনিনগ্রাদে। এবার আমার মনে হলো যদি কেউ না এসে থাকেন, বা এসে ফিরে গিয়ে থাকেন, তবে কি করা যাবে? ভাষা জানি না। ইংরাজী তো লোকে মোটেই বোঝে না। অগত্যা "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে" মনে করে জিনিসপত্র সুদ্ধ নামবার উপক্রম করছি, এমন সময় শুনতে পেলাম "নমস্তে জী"। একটি দীর্ঘাকার যুবক এগিয়ে এলেন সহাস্য মুখে; তাঁর কণ্ঠে আমার দেশী ভাষায় ঐ অভিবাদন শুনতে পেলাম—প্লেনের ভিতরেই। তাঁর নাম পেচাংকো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এলেন আমাদের পূর্ব পরিচিতা শ্রীযুক্তা ভেরা আলেকসান্দ্রোভনায়া, নভিকভা। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে দেবার দরকার নেই। আমার স্বামী ও আমার তিনি পূর্ব পরিচিতা, ভারতে তিনি কয়েকবারই গিয়েছেন। আমার স্বামী তাঁকেও আমার শীতবস্ত্রাদির ন্যূনতার আশংকা করে পত্র দিয়েছিলেন। ফলে তিনিও কোট এনেছিলেন। এখানে গহনাপত্রের মতো কোটই লোকের প্রধান সম্পত্তি। নভিকভার সেই কোট আমার নতুন কোট না কেনা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। শ্রীযুক্ত পেচাংকো মারাঠী জানেন; মারাঠা ইতিহাস তাঁর অধ্যাপনার বিষয়। শিষ্টাচার শেষ হলে জানলাম যে শ্রীযুক্ত পেচাংকো লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক ডীন (প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের)। শ্রীযুক্তা নভিকভা উক্ত বিভাগের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষা। তিনি এখানকার বাংলা ভাষার বিশারদও। এই দু জনকে দেখে ও দেশের ভাষায় কথা কইতে ও শুনতে পেয়ে আর আমার অসুবিধা বা অপরিচয়ের কথা বিশেষ মনে হলো না। এরপর আবার সেই কাস্টমস্ ও অন্যান্য পর্ব শেষ করে মালপত্র সুদ্ধ ট্যাক্সিতে ওঠা গেল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নেভা নদীর আঁকে বাঁকে ছড়ানো দ্বীপগুলির উপর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঝীরভস্কি প্রোস্পেক্টে আমার জন্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে এসে পৌঁছলাম।

লেনিনগ্রাদও দেখলাম মস্কোর মতোই তুষারে সমাচ্ছন্ন। উপরন্তু প্রথম দর্শনেই বুঝলাম সে অশ্রুমতী এবং বায়ুরোগগ্রস্তা। শুনলাম তার কারণ, নেভা নদীর মোহনা কাছাকাছি, তা ফিনল্যাণ্ড সাগরে পড়েছে। সুতরাং সমুদ্র মোহনার সুবিধা আর অসুবিধা দুই-ই তার আছে। সে শহর আবার আর্কটিক অঞ্চলেরও বেশ কাছে। সমস্ত রাস্তাটায় ভিজে ভিজে বাদলা হাওয়া যেন সর্বাঙ্গ জড়িয়ে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠতে লাগল। লেনিনগ্রাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা উৎফুল্ল হবার মতো নয়। এমন সীসামোড়া আকাশ দেখেই আমার মন-মাথা খারাপ হয়ে যায়। ভারতে আমাদের অনেক কিছু নেই, তা জানি; কিন্তু যা আছে সেই অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণের সোনা-ঢালা আলোর কি তুলনা হয়? সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি, শীতের প্রকোপ সকল কিছুতেই সেই সূর্যালোক আমাদের আশ্রয়। সেই সূর্য এখানে দুর্লভদর্শন। অনেক রাস্তাঘাট পেরিয়ে শেষে আমার আস্তানায় গাড়ি এসে দাঁড়াল। লেনিনগ্রাদ খানিকটা দেখতে পেলাম পথেই। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সামান্য রূপ তুলনা করতে হলো—তা না করলে লেনিনগ্রাদিস্টরা আপনাকে নিষ্কৃতি দেবে না। মস্কো এখন প্রধান নগরী, কিন্তু লেনিনগ্রাদ রুশ সংস্কৃতির গৌরব। আমিও দেখলাম—মস্কো মহানগরী, সুবিশাল—ষাট লাখ লোকের শহর। লেনিনগ্রাদে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস, সে সুন্দরী বরাঙ্গিনী, সুচারুগঠনা। ২৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম পিওৎর (পিটর দি গ্রেট্) নেভার মোহনায় এ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চাইছিলেন সমুদ্রযাত্রার পথ, দেশের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পশ্চিমাভিমুখে। তারপর থেকে জারদের আমলে এ শহর ছিল রুশিয়ার রাজধানী। পিওৎরের নামেই তার নাম হয়েছিল সেণ্ট্ পিটর্সবুর্গ। প্রাসাদে অট্টালিকায়, জাঁক-জমকে, সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বিলাসে—শিল্পে সংস্কৃতিতেও—পিটর্সবুর্গ ভরে ওঠে। আবার অক্টোবর বিপ্লবেরও তা স্মৃতিকাগার। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সহস্র দিবসব্যাপী অনমনীয় সংকল্পের তা অপরাজেয় তীর্থক্ষেত্র। যাক্, আমাকে এ শহরে থাকতে হবে, দু' বছর বসে তার পরিচয় গ্রহণ করতে পারব—এখন শুধু দেখছি তার বহিঃসজ্জা।

বাড়ির দুয়ারে ট্যাক্সি থামল। মানতে হবে রাস্তাটি প্রশস্ত, তার চেয়েও বেশি বাসোপযোগী উদ্যানে-আলয়ে সুরম্য। জিনিসপত্র কী করে নামাব ভাবছি। শ্রীযুক্ত পেচাংকোই (আমাদের সহকারী ডীন) তৎপরতার সঙ্গে তা নামিয়ে লিফ্ট-এ তুলে ফেললেন। তারপর একে-একে তা আমার নির্দিষ্ট

কামরায় পৌছে দিলেন। দেশে এরূপ পরিস্থিতিতে আগে পড়ি নি, সুতরাং তুলনা করার সুযোগ নেই। তবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এই যে, এখানকার মানুষ কোনো রকম কাজকেই নিচু কাজ মনে করে না, বা তাতে মানহানির তোয়াক্কা রাখে না। শ্রীযুক্ত পেচাংকোকে মুখে ও মন থেকেও ধন্যবাদ জানালাম। তাঁদের সঙ্গে এবার আমার বাসস্থানে গৃহাভ্যন্তরে পা বাড়ালাম।

একটি বৃহৎ ফ্ল্যাটকে দুইভাগ করা হয়েছে। এক অংশে একজন দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপিকা থাকেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্তা আদিলক্ষ্মী।* তিনি এখানে গত চার বৎসর আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তামিল ও তেলেগু ভাষার অধ্যাপিকা। তিনিও আছেন একা—স্বামী মাদ্রাজে বেতার পত্রিকা 'বাণীতে' ভাল কাজ করেন। প্রথম এসেই এই মহিলাটির কাছে আমি নূতনত্বের ধাক্কা কাটিয়ে অনেকখানি সহায়তাও পেলাম। চার বৎসরে তিনি এখানে সংসারপত্র গুছিয়ে বসেছেন—আমি একেবারে অথৈ আগন্তুক। কিছুক্ষণ পরে আদিলক্ষ্মী নিজের ঘর থেকে বাইরে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। দেখলাম চার বৎসরে তিনি রুশ ভাষাটা সুন্দররূপে আয়ত্ত করেছেন। তিনি সকলকার চায়ের ব্যবস্থা করলেন। আরো খানিকটা পরে অপর সকলে বিদায় নিলেন। ঠিক হলো ১৫ তারিখে সোমবার আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিতে হবে। এজন্য শ্রীযুক্ত পেচাংকো সেদিন সাড়ে নয়টায় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আর ১৪ তারিখ রবিবার শ্রীযুক্তা নভিকভার কাছে আমার ও আদিলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ রইল দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্ণে।

আমিও সেদিনের মতো শ্রীযুক্তা আদিলক্ষ্মীর আতিথ্য গ্রহণ করে তৃপ্তি পেলাম। দশই জানুয়ারির পর থেকে খাদ্য যা গ্রহণ করছি, সে সকল খাদ্য আমার অনভ্যস্ত। এই প্রথম ভাত তরকারী বোতলে-রক্ষিত সীম, এবং সম্বর জাতীয় টক দাল খেতে পাওয়া গেল। তাঁকেও ধন্যবাদ জানালাম। তাঁর কাছেই শুনলাম—পরদিন রবিবার একজন বাঙালী ডাক্তার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। লেনিনগ্রাদেও বাঙালী কাউকে দেখব, একথা তখনো কল্পনা করতে পারি নি।

সেদিনটা সামান্য গোছগাছ করে বিশ্রাম করব। আমার দু'খানি ঘরের ছোটটি শয়নকক্ষ; অন্যটি রীতিমত বড়, তা বসবার, কাজ করবার ও খাবার

* ইনি গত ৩০শে জুলাই (১৯৬২) লেনিনগ্রাদেই অকালে মারা গিয়েছেন। সম্পাদক

ঘর। রান্নাঘর ও স্নানঘর শ্রীযুক্ত আদিলক্ষ্মীর সঙ্গে একত্রিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া গ্যাসের চুলা, টেলিফোন, রেডিও, আসবাবপত্র, সবই আছে। আজ আর বেলা নেই, কালও কাজ নেই। তাই শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম সহজে এল না। প্রথমত নূতন জায়গা, দ্বিতীয়ত এই স্থানে আমাকে থাকতে হবে দু'টি বৎসর;—এরূপ নানা মিশ্রিত চিন্তা আমার মনকে আলোড়িত করতে লাগল।

পরের দিন ডাক্তার মুখার্জি এলেন। এঁরা কলকাতার লোক। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ইনি আই-এম-এস্ ডাক্তার। ভারতসরকার তাঁকে এদেশে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশেষ শিক্ষার বিষয় হল—অত্যুচ্চগামী বিমানে যাত্রীদের দৈহিক ক্রিয়া, বিশেষ করে হার্ট ও হায়ার নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়ার কখন, কি ভাবে ও কতভাবে পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধান করা। সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে আমাদের সরকার কিছু জেট বিমান খরিদ করছেন। এসব জেট্‌বিমান মেঘলোকের দূরতম উচ্চতায় আরোহণ করে, তাই ওসব শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধেয়। সেই সূত্রেই ডক্টর মুখার্জিকেও এদেশে পাঠানো হয়েছে। বিদেশে প্রথমেই এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী বাঙালী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বড়ো ভালো লাগল। মাস তিনেক তিনি এসেছেন—আরও প্রায় দেড়মাস লেনিনগ্রাদে থাকবেন। প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমাদের বাসায় দেখা করতে আসতেন। আমারও তাঁকে মনে হতো একটি স্নেহভাজন আত্মীয়। মানুষটি ডাক্তার। কিন্তু পড়াশুনো নানা দিকে, কাজেই আলাপ-আলোচনায় মার্জিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত সর্বদাই। আরও পাওয়া যেত সরস কৌতুকের অনুভূতি। এই হিউমার বা কৌতুকবোধ খুব বেশী লোকের থাকে না। মার্জিত বুদ্ধির ও সরস হৃদয়ের একটা সমন্বয় শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তা বাঙালী চরিত্রের একটা অনুশীলনীয় গুণ। অথবা বলব, তা নিয়েই বাঙালী চরিত্র। ডাক্তার মুখার্জি অন্তত এরূপ একজন বাঙালী।

পূর্ব দিনেই শ্রীযুক্তা নভিকভা শুনেছিলেন ডাঃ মুখার্জির কথা। তিনি বাঙালী আর নভিকভা বাঙলার অধ্যাপিকা। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের জানিয়ে যান—আমাদের সঙ্গে সেদিন ডক্টর মুখার্জিও তাঁর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলে তিনি সুখী হবেন। ডক্টর মুখার্জিকে তার সমাদরপূর্ণ নিমন্ত্রণের কথা জানানো হল। তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা তিন

ভারতীয় ডাল ভাত তরকারী খেয়ে রুশ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। একটা আশ্চর্য যোগাযোগ—ডাক্তার মুখার্জি, আদিলক্ষ্মী ও আমি তিনজনেই নিরামিষাশী—বাঙালী হয়ে, ডাক্তার হয়েও যুবক মুখার্জির এমন মতিগতি! এই কারণেই আমাদের আলাপ-আলোচনা আরও বেশি জমল। রবিবার দুপুরে একত্র বসে খিচুড়ী কিংবা নিরামিষ ঝোল ভাত খেতে খেতে আনন্দকর একটা আত্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠল। ছুটির দিনটা ছুটির মতো করেই সকলে উদ্‌যাপন করতে লাগলাম।

অপরাহ্ণে বাসে করে আমরা চললাম শ্রীযুক্তা নভিকভার গৃহে। শহরের এটি নূতন অঞ্চল—অনেক সাত-আট তলা বাড়ি উঠছে। তারই একটি বাড়িতে নিচের তলায় ছোট সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট। তবে আধুনিক ব্যবস্থা সবই তাতে আছে—অবশ্য টেলিফোন ও কেন্দ্রিক তাপের আয়োজন এই মহলে এখনো হয়ে ওঠে নি। স্বামী (নভিকভ্‌) ও একটি ছেলে (মিরোঝা) নিয়ে ভেরা আলেক্‌সেন্দ্রিয়োভনায়ার সংসার। আলমারি-ভরতি বাঙালা বই-এর রাশি মনকে চমৎকৃত করে তুলল। জানালায় আছে একটি ক্যাক্‌টাসের টব ও লেবু গাছ। সিরোঝা ছেলেটি প্রিয়দর্শন—দেখতে পিতা নিকোলাস নভিকভের মতো। শ্রীযুক্ত নভিকভ ফোক্‌লোরিষ্ট, লোককথাবিদ্‌; তিনি রুশ সাহিত্যের ইন্‌ষ্টিটিউটের ঐ বিভাগের গবেষক। এঁদের ফ্ল্যাটেও তিনখানি ঘর—সাধারণত এত ঘরের ফ্ল্যাট্‌ এদেশে কারও কপালে জোটে না। এঁদের বইপত্র শুদ্ধ ফ্ল্যাটখানি তবু বড়ো কিছু নয়। তবে স্বচ্ছল গৃহকর্ত্রীর সযত্ন ও নিপুণ হস্তস্পর্শের আভাস তাতে পাওয়া গেল। ছেলেটি ডাক-টিকেটের ভক্ত, ইংরেজীও একটু-একটু বলতে পারে। শ্রীযুক্ত নভিকভ্‌ ইংরেজী জানেন না। আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় যা হল তা তাই হল ভেরা নভিকভার ও আদিলক্ষ্মীর মাধ্যমে।

তারপর আহারের পালা। আমাদের জন্য বিশেষ করে নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্মিতানা সহযোগে আলুর চপ তার একটি বিশেষ উপকরণ। এ ছাড়া, ছানার পুর দিয়ে পাটিসাপ্‌টার মতো একটা বিশেষ পদও নভিকভা রন্ধন করেছেন। প্লাম বা আড়ুবোখরার চাট্‌নিও ছিল। আর শেষে এল সেই লিমন, চা-কেক এবং ফল। দেখছি ভোজন এদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে, দফায় দফায় হয়। আহারান্তেও কিছুক্ষণ গল্প চলল। ফিরবার জন্য ট্যাক্সি কিন্তু পাওয়া গেল না। রবিবারের সন্ধ্যা, বাসে ট্রামে ভয়ানক ভিড়। ট্যাক্সির অভাবে শেষ পর্যন্ত একটি বাসেই আমাদের গৃহস্থরা উঠিয়ে দিয়ে

গেলেন। তাঁদের 'দোঃসিদানিয়া' শুনতে শুনতে বাস ছাড়ল। কিন্তু সমস্ত রাস্তাটা আমরা দুই ভারত-কন্যা সহযাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে চললাম।

রুশীয়রা কন্টিনেণ্টা পিপ্‌ল্‌—দ্বীপবাসী ইংরেজের মতো চুপচাপ নয়। ঢিলেঢালা প্রকৃতি, অজস্র কথা বলা তাদের অভ্যাস। সুতরাং কাছাকাছি সমস্ত আসন থেকেই প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল—বিশেষত আমার কপালে আদিলক্ষ্মীর মতো কুঙ্কুমের ফোটা নেই কেন? অতএব, আমি পাকিস্তানী কিনা। বাঙলা দেশের নিয়মানুযায়ী সিঁথিতে সিঁদুর পরতে হয়, মাথার আবরণ সরিয়ে তাদের তা দেখাতে হলো। বাঙলা ও মাদ্রাজ দুটো ভিন্ন রাজ্য, একথা আদিলক্ষ্মী তাদের বোঝালেন। তারপর আমরা কে, কেন এসেছি, কোথা থাকি, এ সব প্রশ্ন। অবশেষে তাঁরাও নিজেদের পরিচয় দিলেন—তাঁরা একদল ইঞ্জিনীয়ার। আমি অবশ্য আদিলক্ষ্মীর সহায়তাতে এসব শুনছিলাম। আমরা নিজেদের পাড়ায় এসে গিয়েছি। তাঁরা জানালেন—ভারতবর্ষকে তাঁরা ভালোবাসেন আর ভালোবাসেন নেহরুকেও। একথা সত্য, তার প্রমাণ অন্যত্রও দেখেছি। তবু এই জানা কথাটাও কানে বেশ ভালো লাগল এখন। ভাবলাম আমার দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা আমাকেও আত্মীয় রূপেই চান।

যাত্রার পালা শেষ করে কাল থেকে কাজের পালা যখন শুরু হবে তখন দু' বৎসরের মতো এই বিদেশে এই বোধটুকু হবে আমার প্রধান সম্বল।

সাম্প্রতিককালে দর্শনের দুই শিবিরের সংগ্রামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

বি. বীখোভ্‌স্কি

সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি নূতন অধ্যায়ে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার এবং সমগ্র চিন্তা-জগতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধ নবরূপ ধারণ করে। শুধু যে এই বিরোধের লক্ষ্যই বদলে যায় তাই নয়, পদ্ধতি ও কৌশলেরও বদল হয়। একশ বছর আগে মার্কসীয় দর্শনের অস্তিত্বের প্রথম যুগে এর বিরোধীরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সম্পূর্ণ অবহেলা করত, নীরবতার অস্ত্রে বস্তুবাদের এই সর্বোচ্চ রূপের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করত। লড়াইয়ের এই পদ্ধতি গ্রহণের কারণ যে কেবল বৈপ্লবিক দর্শনের প্রতি মনোযোগ না দেবার চেষ্টা তা নয়; শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দর্শনের সাথে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতাও তার অন্যতম কারণ।

সাধারণভাবে কিছুদিন আগে পর্যন্তও পুঁজিবাদী জগতের অধিকাংশ সমাজ-স্বীকৃত (academic) দার্শনিকের জ্ঞান-পরিধির বাইরে ছিল মার্কসীয় বস্তুবাদের অবস্থিতি। সেখানে ছাত্ররা মূলত পরিচিত হতো বহু শতাব্দী পূর্বের দর্শন-গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে; তারা মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বসমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব অনায়াসে দিতে পারত—যে সব প্রশ্নের কোনো তাৎপর্যই আজ নেই। কিন্তু তাদের কাছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ উপস্থাপিত করা হতো এমন ভাবে, যেন তা কোনো আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন দার্শনিকের মনোযোগের অযোগ্য বিষয়। উদাহরণস্বরূপ ফরাসী অস্তিত্ববাদীদের প্রধান জঁ পল সার্ত্রে'র স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "১৯২৫ সালে আমার বয়স যখন কুড়ি বছর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস্‌বাদ পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সাম্যবাদী ছাত্রদের সাবধান করে দেওয়া হতো, তারা যেন আলোচনার মধ্যে মার্কস্‌বাদের প্রসঙ্গ না তোলে, এমন কি তার উল্লেখটুকুও যেন না করে, কারণ তা করলে তারা পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পাবে না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্পর্কেই এমন একটা

ভীতি ছিল যে আমাদের হেগেলীয় দর্শনও ঠিকমতো পড়ানো হতো না।... হেগেলীয় ঐতিহ্য, মার্কস্‌বাদী শিক্ষক এবং চিন্তার কোনো কর্মসূচী ও হাতিয়ারের অভাবে আমাদের কালের ছাত্ররা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত হতে পারত না—আমাদের আগের যুগেও ছিল একই অবস্থা, পরের যুগেও অন্যতর কিছু হয় নি।" প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি এই অবস্থা হয়, তবে মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি অবস্থা ছিল সহজেই অনুমান করা যায়।

বুর্জোয়া আদর্শের ধারকগণ তরুণ সমাজের উৎসুক সন্ধানী বুদ্ধিকে বর্তমান যুগের সর্বাগ্রসর দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু মার্কস্‌বাদ নব নব গৌরব অর্জন করতে থাকল। সরকারী পুঁথিবাগীশ দার্শনিকদের নীরবতার চক্রান্ত সত্ত্বেও এই দর্শন লোকচিত্তে স্থান লাভ করে সমাজচেতনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হলো।

মার্কস্‌বাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নীরবতার স্থান গ্রহণ করল গভীর বিচারের অনুপযোগী একটা 'বৈচিত্র্যহীন ও আদিম দর্শন' হিসাবে এর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য-সূচক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ। সমালোচনা-মূলক বিশ্লেষণের বদলে পাওয়া গেল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য এবং স্পর্ধিত ও উন্নাসিক নিন্দাবাণী। তর্কের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে যান্ত্রিক বা স্থূল (vulgar) বস্তুবাদের সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করার কৌশল নেওয়া হলো। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই 'সমালোচকদের' কেউই বিষয়টাকে অধ্যয়ন বা উপলব্ধি করার কষ্টটুকুও স্বীকার করেননি; অবশ্য এই জাতের 'সমালোচকরা' পার পেয়েছেন তাদেরই মধ্যে, প্রকৃত মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে যাদের ধারণা ছিল না।

গত দশ-পনের বছরে অবস্থার পরিমাণগত ও গুণগত বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে ভাববাদের সংগ্রাম নূতন স্তরে উপনীত হয়েছে, তার প্রকৃতিতেও দেখা দিয়েছে নূতনত্ব। শেষ হয়েছে নীরবতা ও তাচ্ছিল্যের ষড়যন্ত্রের পালা। আমাদের পরাদর্শগত শত্রুরা নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করেছেন। মার্কস্‌বাদী দর্শন সংক্রান্ত গভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিস্তারিত সমালোচনা বহুক্ষেত্রে সমকালীন ভাববাদী দার্শনিকদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিপুল অংশ অধিকার করেছে।

ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে তীব্র, নির এবং অক্লান্ত সংগ্রাম চলেছে, এমনটা আর কখনো দেখা যায় নি।

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বিগত দশকে যত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে এবং যত বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, মার্কস্‌বাদের আগের একশ বছরের ইতিহাসে তা হয় নি বললে ভুল করা হয় না। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। গত দশ বছরে মার্কস্‌বাদী বিশ্বদৃষ্টি মানবসমাজকে যতটা প্রভাবান্বিত করেছে, এমনটা আগে কখনো হয় নি। সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমাগতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সামাজিক আর্থনীতিক সাফল্য এবং সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কীর্তির কথা সর্বস্বীকৃত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যার দার্শনিক ভিত্তি ঐতিহাসিক সৃজনক্ষেত্রে সেই মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টির সাহায্যে পরিচালিত জাতিসমূহই এই সকল কীর্তির অধিকারী হয়েছে। মার্কস্‌বাদ আজ বুর্জোয়া ভাববাদীদের কাছে এমন ভয়ংকর ও সুস্পষ্ট বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে যে তাকে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বুর্জোয়া মতবাদের ধারকবৃন্দের সমগ্র শক্তি ও তাঁদের যুক্তিবিদ্যার সমস্ত অস্ত্র কাজে লাগানো হয়েছে।

মার্কিন 'বস্তুবাদী' রিয়ালিস্ট জন ওয়াইল্ড তাঁর কোনো বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন: "সর্বোপরি আমরা যে শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভাবাদর্শগত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তা কেবল বাস্তব অস্ত্রেই নয়, মতবাদের অস্ত্রেও সুসজ্জিত। সেগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন আইডিয়ার স্তূপমাত্র নয়। তারা একটা দার্শনিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও একটা সম্পূর্ণের মধ্যে সম্বদ্ধ—তার সুপরিচিত নাম হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। তা সমকালীন চিন্তাধারার গভীর উৎসসম্ভূত মহান বিশ্বদর্শন সমূহের অন্যতম।"

"সমসাময়িক পৃথিবীতে মার্কস্‌বাদের প্রভাব এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে এই দর্শন উপলব্ধি ও আয়ত্তীকরণের চেষ্টার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন।"—একটি প্রভাবশালী ইংরেজি দর্শন-পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও অধ্যাপক অ্যাক্টর-এর মার্কস্‌বাদ-বিরোধী পুস্তকের গোড়াতেই এই কথাগুলো রয়েছে। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্সটিটিউট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার বিভাগীয় রিপোর্ট-রচয়িতারা ঘোষণা করেছেন: "সাম্যবাদীদের প্রকৃত গোপন অস্ত্র হলো মার্কসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই ঐতিহ্যের সহায়তায় তাদের চোখে এমন সব তথ্য ধরা পড়ে, যা পশ্চিমী শ্রমিকদের চোখ এড়িয়ে যায়।"

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাররোধকল্পে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম-ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা বুর্জোয়াতন্ত্রের ধারকগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মার্কস্‌বাদ-বিরোধীদের

হাতে অস্ত্র জোগানোর জন্যই জেস্যুইট ও ডমিনিক ধর্মযাজকদের (ওয়েটার, বোখেন্‌স্কি) রচিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধী বৃহদায়তন গ্রন্থসমূহের আবির্ভাব। অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠ্য বিষয় হিসাবে এর প্রচলন হলো। সাম্যবাদ-বিরোধী বিশেষ ধরনের একটা বিশ্বকোষও রচিত হলো ১৯৫৮ সালে। মার্কস্‌বাদ-বিরোধী সমস্ত ধারার শক্তিকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলো বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যেখানে ক্যাথলিক উদ্দেশ্যবাদী (teleologist) ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাট-তত্ত্ববিশারদগণ মিলিত হয়ে "সাম্যবাদ উৎখাত" করার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় করলেন।

সমকালীন ভাববাদী দর্শনের মূল ধারাগুলির পরিচয় দান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আদর্শগত সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে বুর্জোয়া সমালোচনার কয়েকটা বিশেষ লক্ষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই এখানে করা হবে।

রণকৌশলের চূড়ান্ত পরিবর্তনে বুর্জোয়াপক্ষের ভাবাদর্শগত পুনরস্ত্রসজ্জা মোটেই সূচিত হয় না। ভাববাদীদের প্রাচীন দার্শনিক ধারণা-ভিত্তি অটুট রয়েছে; বস্তুবাদের প্রতি তাঁদের তীব্র ঘৃণাও দূর হয় নি। কৌশল, আক্রমণ পদ্ধতি, ছলাকলা এবং সমালোচনারীতির ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কস্‌বাদ-বিরোধী সংগ্রামে নবকৌশলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের প্রচারকদের কয়েকটি স্বীকৃতি এখানে উদ্ধৃত হলো।

আল্‌ফ্রেড মেইএর (Meyer) তাঁর 'মার্কিস্‌জম, ইউনিটি অফ থিয়োরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্' নামক গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন: "আমরা মার্কস্‌বাদকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা নিয়েই লিখেছি—এই ধারণা যাতে না হয় সেই জন্য জোর দিয়ে বলছি যে আমরা বরং মার্কস্‌বাদী বৈজ্ঞানিকদের রূপন-সৌষ্ঠব, মননের ঔজ্জ্বল্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রগাঢ় গুণমুগ্ধতা প্রকাশ করতে চাই।...তাঁদের ধারণাসমূহের ফলপ্রসূতা ও সজীবতা তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে প্রকাশিত।" এর পরের দুশো পৃষ্ঠা নিয়োজিত হয়েছে 'মার্কস্‌বাদ উচ্ছেদে'র কাজে।

মার্কস্‌বাদের সমালোচনায় নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য অকপটভাবে সুপরিচিত ক্যাথলিক দার্শনিক গুস্তাভ্‌ ওয়েটার ব্যক্ত করেছেন: "সাম্যবাদ-বিরোধিতায় খুব বেশি রঙ চড়িয়ে কেবল কালো ও সাদায় ভাগ করার বিপদ

রয়েছে, কারণ এতে বিরোধী পক্ষের এক ফোঁটা কৃতিত্বও স্বীকার করা হয় না ; বরং তার কৃতিত্বের যেটুকু আছে তাকেও নাকচ করা হয়। এই বিরোধিতাকে অতিরঞ্জন বলে লোকে যতই বুঝতে পারে, ততই এর খণ্ডন যুক্তি সমূহে তাদের সন্দেহ জাগে এবং তারা আরো সহজে শত্রুপক্ষের সূক্ষ্মতর প্রচারে বিশ্বাস করতে থাকে।" অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় আপনি মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করাতে হলে তার সীমাটা জানা দরকার।

বর্তমান পর্যায়ে দর্শনের দুই শিবিরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ এই নূতন কৌশলটি সমকালীন বিভিন্ন ভাববাদী মহলে মার্কস্‌বাদের 'মর্মকোষজাত সমালোচনা' (immanent criticism) হিসাবে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর সারকথা হলো এই যে এতে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বাইরের থেকে পূর্ব গঠিত বস্তুবাদ-বিরোধী ধারণাসমূহের পাদপীঠ থেকে সমালোচনা করা হয় না, এমন ভাবে করা হয় যেন মার্কস্‌বাদের পাদপীঠ থেকেই করা হচ্ছে বলে মনে হয়। ফলের ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে ফেলার জন্যে পোকা-মাকড়ের যে কৌশল, এ হলো তাই। মার্কস্‌বাদ-বিরোধীরা বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রাথমিক সূত্রগুলি শর্তাধীনে স্বীকার করে নেন ; উদ্দেশ্য হলো, সব রকম ব্যাসকূটের সাহায্যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে বস্তুবাদ-বিরোধী, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা। সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের উদ্ভাবনা, বিকৃতি, কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা ও মার্কসীয় তত্ত্ববিরোধী অন্যান্য নীতির সাহায্যে এই জাতের অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকে।

এ সবেরই লক্ষ্য হলো এই 'প্রমাণ' করা যে, মার্কসবাদ সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না, এর কোনো কোনো অংশের সঙ্গে অপরাপর অংশের অমিল রয়েছে, যুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে এর কোনো না কোনো অংশের সঙ্গে অপরাপর অংশের অমিল রয়েছে, যুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে এর কোনো না কোনো সূত্রের স্ব-বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার এ পর্যন্তও বলা হয় যে লেনিনবাদী উপলব্ধির সঙ্গে মার্কস্‌বাদের সামঞ্জস্য নেই, এঙ্গেল্‌স্‌-এর মত মার্কসের তত্ত্বকে খণ্ডন করে এবং মার্কস্‌ও তাঁর চিন্তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে স্ব-বিরোধিতা করেছেন ইত্যাদি।

আলংকারিক ভাবে বলতে গেলে এই নতুন কৌশলটা হলো এই যে মার্কস্‌বাদের সমালোচকেরা মার্কস্‌পন্থীদের সঙ্গে কয়েক পা একসাথে চলে তাদের সতর্কতা শিথিল করে দিয়ে মেরুদণ্ডে চোরা আঘাত হানার চেষ্টা করে।

প্রায়শই 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার প্রতিজ্ঞাগুলি (propositions) বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সূত্রাবলীর এমন ভাষ্যে রূপ লাভ করে যাতে সেগুলি প্রকৃত স্ব-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয় এবং তার পর প্রমাণ করা কঠিন হয় না যে বুর্জোয়া দর্শনের সনাতন সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মতো ভিত্তি মার্কসবাদীদের নেই।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত আক্রমণের ক্ষেত্রে এখন 'মর্মকোষজাত' সমালোচনারীতি সর্বাগ্রগণ্য। ডমিনিক দার্শনিক বোখেন্‌স্কির মতো হিংস্র সাম্যবাদ-বিরোধীও এর প্রশংসা করেছেন। কিছুদিন আগেও তিনি কঠোরভাবে ঘোষণা করেছিলেন : "ডায়ামেট (ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) শুধু ভ্রান্ত দর্শনই নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি—এটা পাপ বিশেষ।···খ্রীষ্টানদের পক্ষে এটাকে শুধু মূর্খতাপ্রসূত ও মিথ্যা নীতি হিসাবে দেখলেই চলবে না, তাদের মনে রাখতে হবে এ হলো শয়তানী জাদুবিদ্যা।" এখন সেই বোখেন্‌স্কিই অন্য ভাষায় কথা বলেছেন : "সাম্যবাদী দর্শনে নিঃসন্দেহে বহু সঠিক ধারণা রয়েছে···এমন কি যে সব বক্তব্যকে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় সেগুলির (বস্তুবাদ এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অধিকাংশ নীতি) মর্মমূলে সত্যের অস্তিত্ব আছে। এমন কথাও বলা যায় যে এর উপাদানীভূত অংশগুলির প্রায় প্রত্যেকটিরই পক্ষ সমর্থন করা যেতে পারে·· ।" এই কথাগুলিতে নিজের বস্তুনিষ্ঠা ও শুভেচ্ছা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে ধরে নিয়ে বোখেন্‌স্কি এরপর আক্রমণে কোমর বেঁধেছেন। তাঁর পরের কথাটা হলো : "কিন্তু কোনো চিন্তাশীল মানুষই সাম্যবাদীদের কৃতকর্মের সমর্থন করতে পারেন না।"

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধী সংগ্রামে 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার পাশাপাশি আর একটা যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তা হলো ভাববাদীদের পক্ষ থেকে ভাববাদকে মুখোশ পরিয়ে ছদ্মবেশে সাজানোর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। আমাদের বিরোধী পক্ষকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে কিছুতেই বলা চলবে না যে সমসাময়িক দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বস্তুবাদের লড়াই চলেছে ; তার সহজ কারণ হলো এই যে ভাববাদী দর্শনের অস্তিত্বই নেই। অন্তত বুর্জোয়া দর্শনের সাম্প্রতিক কোনো প্রধান ধারাই নিজেকে ভাববাদী বলে মনে করে না, কোনোটিই স্বীকার করে না যে তার তরফ থেকে দার্শনিক ভাববাদের পতাকাতলে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হচ্ছে। কোনো টমিস্ট

(Thomist), অস্তিত্ববাদী (Existentialist), নব্য-যথাস্থিতিবাদী (Neo-positivist), প্রয়োগবাদী (Pragmatist)—কেউই নিজেকে ভাববাদী-দর্শনের প্রতিনিধি বলে মনে করেন না। তাঁদের সকলেই নির্দ্বিধায় নিজেকে দার্শনিক ভাববাদের বিরুদ্ধপন্থী বলে ঘোষণা করতে প্রস্তুত ; এবং প্রায় সেই উপায়েই তাঁরা ভাববাদকে অপ্রমাণ করে থাকেন, যে উপায়ে অপ্রমাণ করেন বস্তুবাদকে।

দর্শন জগতে যা ঘটেছে, তা পুঁজিবাদের স্বপক্ষীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তারই সমধর্মী : পুঁজিবাদের সবচেয়ে উৎসাহী এবং অনমনীয় সমর্থকরাও আজ পুঁজিবাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করছে। কোনো এক অবোধগম্য উপায়ে পুঁজিবাদ 'জনায়ত্ত' হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথবা মোটামুটি অদৃশ্য ও বিকীর্ণ ও রূপান্তরিত হয়ে 'সাম্যবাদী মরীচিকায়' এবং সাম্যবাদীদের অসুস্থ কল্পনার 'শিকারে' পরিণত হয়েছে। একই ভাবে কোনো অবোধগম্য উপায়ে ভাববাদও অদৃশ্য হয়েছে, দর্শনের ক্ষেত্র থেকে। আসলে ব্যাপারটা যেন এই যে সাম্যবাদীরা আগের মতো এখনও দর্শনের দুই শিবিরের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আর অস্তিত্ববিহীন এমন এক দার্শনিক ভাববাদকে আক্রমণ করছে, যার পক্ষভুক্ত সমর্থক কেউই নেই।

ছদ্মবেশী এই দার্শনিক তামাসার মূল কথাটা কি ? এতে সর্বোপরি এটাই প্রমাণিত হয় যে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী নবতম চিন্তাধারার পাশে মর্যাদা হারিয়ে দার্শনিক ভাববাদ নতমুখ হয়েছে। ভাববাদের আর সেই আকর্ষণী চৌম্বক শক্তি নেই। ভাববাদের পতাকাতলে মানুষকে আর সমবেত করা যাচ্ছে না। তাই ভাববাদী বক্তব্যের উপর বৈচিত্র্যময় অভিনব লেবেল সাঁটা দরকার। দার্শনিক স্পষ্টতাকে বিলুপ্ত করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত চেষ্টা, দর্শনের সীমারেখাগুলোকে লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা এবং মূলগত যে সব দার্শনিক প্রশ্ন দর্শনের শক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, তা থেকে মনোযোগ অপসারণের চেষ্টা—বস্তুবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নূতন কৌশলের লক্ষণ হিসাবে এদের গ্রহণ করা যায়।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের সংগ্রামকে বাতিল এবং এই সব ঝোঁককে দার্শনিক কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করে আমাদের মতবিরোধীরা বস্তুবাদী বিশ্ব উপলব্ধিকে চোরা আঘাত হানতে চায়, এই দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্মী বিশ্বদৃষ্টির মধ্যের সীমারেখা মুছে ফেলতে চায়। দর্শনক্ষেত্রে যে কোনো তৃতীয় পন্থা

প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের ধারকদের পরোক্ষ কৌশল না হয়ে পারে না, এটা লড়াইয়ের অস্বীকৃতি নয় বরং বিপ্লবী ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দূরপ্রসারী কৌশল—লেনিনবাদী এই সূত্রটি বার বার প্রমাণিত হচ্ছে।

মার্কসবাদের বিবর্ধমান প্রভাব এবং সমসাময়িক ভাবাদর্শগত সংগ্রামে এর প্রাধান্যবৃদ্ধিতে ভাববাদীরা শুধু কৌশল বদল করতে বাধ্য হয়েছে তা নয়, ভাববাদী শিবিরেও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন-গুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করা দরকার। এই প্রবন্ধে আমরা শুধু কয়েকটা লক্ষণসূচক ঘটনার সাধারণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। প্রথমেই চোখে পড়ে ভাববাদের মৌলিক নানা ধারার ক্রমাবনতি এবং মার্কসবাদের বিপক্ষে মানব-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সুসমঞ্জস বিকল্প কোনো ব্যাপক তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপনায় তার অক্ষমতা। সমস্যার বিচূর্ণীকরণ, মানসদিগন্তের সঙ্কীর্ণ সীমানা রচনা, জীবন ও ভাবনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গভীর বক্তব্য ও বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তের বদলে দর্শনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যাসকূট রচনার চাপল্য—বর্তমান যুগের ভাববাদী অবক্ষয়ের এগুলিই হলো সাধারণ লক্ষণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রয়োগবাদ এক সময়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল তার ভগ্নদশার মধ্যে, বিজ্ঞানের প্রতি কঠোর আনুগত্যের ভান ত্যাগ করে নব্য-যথাস্থিতিবাদীদের অগোপন ধর্মীয় উচ্ছাসের মধ্যে, অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যময় প্রভাব হ্রাসের মধ্যে এবং যথাপ্রতিভাসবাদী সম্প্রদায়ে (Phenomenological school) ও আমেরিকার প্রকৃতিবাদী (Naturalism) মহলে পরস্পরবিরোধী মতবাদের তীব্র আভ্যন্তরীণ বিসম্বাদের মধ্যে সমকালীন ভাববাদী দর্শনের সকল সম্প্রদায়েরই অন্তঃসারশূন্যতা বিচিত্র রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করছে।

বস্তুবাদের সঙ্গে সংগ্রামে যতই পরাজিত হবে ততই ভাববাদের ভাঙন তীব্রতর হয়ে উঠবে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশসমূহের দর্শনক্ষেত্রে জীবনধর্মী যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা ভাববাদের তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত বন্ধ্যাত্ব উদ্‌ঘাটিত করে ধাপে ধাপে সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করবে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পথে অগ্রসর হবে। আমাদের দায়িত্ব এই ঘটনাক্রমকে সাহায্য করা—শুধু ভাববাদের সমালোচনা তীব্রতর করে তুললেই হবে না, পুঁজিবাদী জগতে যে সব দর্শন সম্প্রদায় পথ খুঁজে ফিরছে ও দ্বিধার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে হবে।

ভাববাদী বক্তব্যকে পরিশ্রুত করে মার্কসবাদের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের 'মর্মকোষজাত' সমালোচনার পরিপূরক। মার্কসবাদের ইতিহাসে দেখা যায় নি সম্পূর্ণ অভিনব এমন কিছুই 'মর্মকোষজাত' সমালোচনায় নেই। প্রকৃতপক্ষে এ হলো শোধনবাদীরা বহু পূর্বেই যে সব কৌশল সমূহের ব্যবহার করেছে, সেগুলিরই সম্প্রসারণ মাত্র। বস্তুত দার্শনিক শোধনবাদ—মার্কসীয় পন্থায় সক্রিয় ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণ ভাবে শোধনবাদ ও বিশেষ করে দার্শনিক শোধনবাদ প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের জয়েরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রথম দেখা দেয়। বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ হিসাবে হয় শোধনবাদের আবির্ভাব। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলসমূহে মার্কসবাদী চিন্তার বিজয়ের ফলে জটিলতর নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের বিরোধী-পক্ষের নিজেকে পুনর্গঠন করার ও তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টাটাই এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মতাদর্শের বিশেষ রূপ হিসাবে শোধনবাদের সার কথা হলো এই যে এতে মার্কসবাদী উপাদানের সাহায্যেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়। মার্কসপন্থী ও অন্ততপক্ষে মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মার্কসবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই হলো শোধনবাদী যুক্তিধারার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। এই চেষ্টায় নিযুক্ত সকল শোধনবাদীকেই—কাণ্টপন্থী, মাখ্‌পন্থী, স্বজ্ঞাবাদী, যথাস্থিতিবাদী ও অন্যান্য সকলকেই—মার্কসীয় বিদ্যার পাঠ নিতে হয়েছে। মিথ্যাচার, কূটতার্কিকতা ও সুবিধাবাদী উপাদান নির্বাচনের ভিত্তিতে যে শোধনবাদ গড়ে উঠেছে, তার বিশেষ লক্ষণটি এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

সামাজিক চেতনার নূতন স্তরের সম্মুখীন হবার চেষ্টায় পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রচারের নূতন কায়দা অবলম্বনের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তার মধ্যেই শোধনবাদের উদ্ভব-রহস্য নিহিত। কার্লমার্কসের শিক্ষাবলীর ঐতিহাসিক নিয়তির স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন: "ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি এমনই যে, মার্কসবাদের তত্ত্বগত বিজয়ে তার শত্রুপক্ষ মার্কসবাদী ছদ্মবেশ গ্রহণে বাধ্য হয়।" (লেনিন রচনা-সংগ্রহ, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬)। বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী চিন্তার সাফল্য ও কীর্তির অনুবর্তী হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে শোধনবাদের বিপরীতধর্মী ঢেউ কি ভাবে উঠেছে তা শোধনবাদের যে কোনো ইতিহাস রচয়িতারই চোখে পড়বে।

উনিশ শতকের শেষদিকে মার্কসবাদের প্রসারের প্রতিক্রিয়ারূপে আন্তর্জাতিক সোস্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যে শোধনবাদের আবির্ভাব হয় এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি মার্কসবাদ লেনিনবাদের সাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপুল কীর্তি অর্জনের ফলে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে শোধনবাদী ঝোঁকের উদ্ভব হয়েছে।

দার্শনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমকালীন ভাববাদী দর্শনের সমালোচনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে শোধন করার যে কোনো চেষ্টা বুর্জোয়া দর্শনের কোনো না কোনো প্রচলিত ধারা থেকে অনুপ্রেরণা পায়, তাতে দার্শনিক ভাববাদের সাম্প্রতিক কীর্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষাবলীর সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের কোনো সম্প্রদায়ের বক্তব্যের সংযোগ সাধন করে মার্কসবাদকে এই সব 'কীর্তি'র সাহায্যে 'সমৃদ্ধ', 'গভীরতর' এবং 'ব্যাপকতর' করার উদ্দেশ্যে তার সমালোচনা করা হয়। সুতরাং শোধনবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হলে প্রথমে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য, এর মার্কসবাদ-বিরোধী চরিত্র এবং সমকালীন বুর্জোয়াদর্শনের ধারা বিশেষের সঙ্গে এর রক্ত-সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়ে, তার পর যে সব ভাববাদী বক্তব্যের সাহায্যে কোনো শোধনবাদী দার্শনিক মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকৃত করছে তারই তথ্যাতথ্যের ভিত্তিতে তাকে নাকচ করতে হবে। শোধনবাদীরা যে সব বুর্জোয়া ভাবধারার মোহে মুগ্ধ হয়, যতদিন সেগুলো খণ্ডিত এবং নির্মূল না করা হচ্ছে, ততদিন শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে। সুতরাং সমসাময়িক বুর্জোয়া দর্শনের বহু বিচিত্র ধারার সঙ্গে সংগ্রাম শোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। দুটোই পাশাপাশি চলে; শোধনবাদের সমালোচনা বুর্জোয়া দর্শনের সমালোচনার উপর নির্ভর করে এবং পরবর্তী ধাপে নিজেই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কসবাদের সমসাময়িক 'সমালোচক'দের রণপদ্ধতির যে সব বিশেষ কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের সাধারণ চিত্র আঁকা হলো, তা আরো পরিষ্কার হবে, যদি আমরা লক্ষ্য করি কি ভাবে এই উপায়গুলো মার্কসবাদ-বিরোধীদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে জাঁ পল সার্ত্র ও এ. লেফেভ্‌র্ (Lefevre)—এই দুজনের সর্বাধুনিক রচনাগুলিকে গ্রহণ করা যায়; প্রথম জন 'মর্মকোষজাত' সমালোচকদের আদর্শস্থানীয় প্রতিনিধি, এবং

দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্কসবাদের 'সংশোধন' ও শোধনবাদী বিকৃতি সাধনক্রিয়ার নেতৃস্থানীয়।

জঁ। পল সার্ত্রের আধুনিকতম দার্শনিক রচনা 'দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার সমালোচনা' (Criticism of Dialectical Reason) আমাদের সামনে রয়েছে। বইটির আদ্যোপান্ত মার্কসবাদ-বিরোধিতায় নিয়োজিত। সার্ত্রের শান্তির সপক্ষে বাণী এবং আলজিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কুশ্রী লড়াইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদকে আমরা যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি। কিউবার জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকপট সহানুভূতি আমাদের প্রশংসা পায়। কিন্তু সাথে সাথে যে ভ্রান্তির উপর তাঁর দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাও আমাদের হতাশ না করে পারে না।

'মর্মকোষজাত সমালোচক'দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে সার্ত্র সমাজচিন্তার বিবর্তনে মার্কসবাদের বিরাট ভূমিকার উচ্চ মূল্যায়ন দিয়ে গ্রন্থের সূত্রপাত করেছেন; বলেছেন যে মার্কসবাদকে অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়া, এর অবদানকে মর্যাদা না দেওয়া বা এর কীর্তিনিচয়ের দ্বারা পরিচালিত না হওয়া সম্ভবপর নয়। সার্ত্র ঠিক কথাই বলেছেন যে মার্কসীয় চিন্তাসম্পদের মার্কসবাদ-বিরোধী খণ্ডন প্রচেষ্টা প্রাক্-মার্কসীয় ধারণাবলীর পুনরুজ্জীবনের আশাহীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। সার্ত্র চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করেন না যে মার্কসবাদ পুরনো হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূল কথা হলো এই যে মার্কসবাদ এখনো পূর্ণতা লাভ বা আধ্যাত্মিক পরিণতি অর্জন এবং বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই এর ক্রমাগ্রসরণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সার্ত্র তাঁর আবিষ্কৃত মার্কসবাদের 'নিশ্চলতা' দূর করে তার অব্যবহৃত নিহিত শক্তিকে মুক্তিদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

শোধনবাদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের নৈকট্য সম্পর্কে যে কোনো ইঙ্গিতকেই সার্ত্র সুদৃঢ় ভাবে অস্বীকার করেন, কোনো শোধনবাদের কথা বলা চলবে না—বললে তা হবে মামুলী ছেঁদো কথা, নতুবা মূর্খামি। এর কারণটা এ নয় যে শোধনবাদের অস্তিত্ব নেই, বরং ঠিক তার বিপরীত: যা শোধনবাদ নয় এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই; আমরা সকলেই শোধনবাদী; শোধনবাদ ছাড়া কোনো ধরনের চিন্তাকর্ম সম্ভবপর নয়। সার্ত্র বলেন: "যাঁরা নিজেদের পূর্বসূরীদের বিশ্বস্ততম সমর্থক বলে মনে করেন, পূর্বসূরীদের ধারণানিচয়ের

পুনরাবৃত্তি করার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেগুলির পরিবর্তন সাধন করে বসেন; নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে।" এক কথায় চরম অভিন্নতা অসম্ভব ব্যাপার এবং সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে কিছুরই পুনরাবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপনা সম্ভবপর নয় এবং সকল পুনরাবৃত্তি ও অনুকৃতির মধ্যেই শোধনক্রিয়াটি লুকিয়ে থাকে।

এটা নজরে আনা কঠিন নয় যে এই বিচারের ভিত্তিতে রয়েছে ন্যায়শাস্ত্রীয় তার্কিকতা—দ্বান্দ্বিক মনোভাবের পরিবর্তে একটা সাপেক্ষবাদী (relativisim) মনোভাব। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির এই ধরনের ব্যাখ্যা অস্তিত্ববাদীদের সমস্ত দার্শনিক পদ্ধতির একটা প্রধান লক্ষণ। তাঁরা যখন বলেন: "সত্যের বিবর্ধনই আমাদের কাছে সার কথা, সত্যের অস্তিত্ব ও তার বিকাশে আমরা বিশ্বাস করি," তখন তাঁরা এই বক্তব্যের মধ্যে দ্বান্দ্বিকের পরিবর্তে সাপেক্ষবাদী বিষয়বস্তুই অনুপ্রবিষ্ট করেন। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর একটা সূত্রে: "আমাদের মতে, দর্শন যাকে বলে তার অস্তিত্ব নেই…বাস্তবিক যা আছে তা হলো দর্শনসমূহ।" কোনো সমস্যার প্রকৃত দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির মূল, যে এ সম্বন্ধে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবের একটাকে বাদ দেওয়ার মধ্যে নেই, রয়েছে বরং তাদের ঐক্যকে আবিষ্কার করার মধ্যে, বাস্তবসত্যকে তার বিবর্তনের সঙ্গে মেলানোর মধ্যে, দর্শনের ক্রমবিবর্তন তার ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মধ্যে—এটাই লক্ষ্য করা দরকার।

যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে এই বিচার করলে আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই: মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সার্ত্রের মার্গের (gnoseology) বৈপরীত্যটা কোথায়?

সার্ত্র সরাসরি বলেন যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাঁকে পরিতৃপ্ত করে না এবং মার্কসীয় দর্শনের দুর্বলতম অংশ হলো এটাই। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের 'দুর্বলতা' হলো এই, এতে আত্মমুখীনতাকে দাবিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ এ তত্ত্ব কেবলই বস্তুনিষ্ঠ। যে এ জ্ঞানতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, যে এটা বস্তুভিত্তিক প্রতিবিম্বনবাদ।

সার্ত্রের সমস্ত লেখার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে আত্মমুখীনতার ও বস্তুনিষ্ঠার মধ্যে দ্বান্দ্বিক পারস্পরিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে, এবং তাদের আধিবিদ্যক (metaphysical) বিরোধিতা সম্বন্ধে তাঁর অনুপলব্ধি।

সার্ত্রের কাছে আইডিয়া হলো সংগ্রামের অস্ত্র মাত্র। তিনি তাদের বস্তুসারকে

অবহেলা করেন। এ হলো প্রায়োগিক (pragmatic) ও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি-বিশেষ ; সোরেল ও প্যারেটোর মতবাদের এবং 'কল্পকথা-তত্ত্বের' (theory of myths) কাছাকাছি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা মার্কসীয় প্রতিবিম্বন-তত্ত্বের নিকটবর্তী নয়।

যে জ্ঞানতত্ত্ব সার্ত্র পোষণ করেন এবং যা মতাদর্শের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর বিচারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে তা আসলে আত্মকেন্দ্রিক (subjectivist) জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ। সমকালীন 'পদার্থ-বিজ্ঞানী' ভাববাদীদের মতামতের উপর নির্ভরশীল 'জ্ঞানমার্গীয়' (gnoseological) ধারণাবলীই এতে প্রস্তাবিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন : "বর্তমানে একমাত্র যে জ্ঞান-তত্ত্বটি সিদ্ধ, তার ভিত্তি সূক্ষ্ম পদার্থবিদ্যায় (micro-physics) প্রমাণিত সত্যের উপর ; এতে পরীক্ষাকারীও পরীক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।" এটা সুবিদিত যে, মার্কসীয় প্রতিবিম্বন-তত্ত্ব জ্ঞাতার সক্রিয়তাকে যোগ্য স্থান দিলেও কখনোই বিষয়ী ও বিষয়ের সীমানা মুছে ফেলে না বা জ্ঞানের বস্তু-নির্ভরতাকে অস্বীকার করে না। নির্ভুলতার উপরই মার্কসবাদের শক্তি নির্ভরশীল—এই মর্মে লেনিনের যে কথা, তা কোনক্রমেই এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় যে মার্কসবাদেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। মার্কসবাদ শুধু যে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশই করে তা নয়, বাস্তবে তাকে রূপায়িত করার শক্তিও তার আছে—আমাদের এই বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত বক্তব্য দুটির ঐক্যের উপরে।

কিন্তু সার্ত্রের নিজের স্বীকৃতি অনুসারে যা তাঁকে অস্তিত্ববাদের দ্বারা মার্কসবাদের 'পরিপূরণে' প্রণোদিত করেছে, সেটা আসলে কি ? তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : "শুধুমাত্র মার্কসবাদী হতে আমাদের বাধাটা কি ?" সার্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে উত্তর দাঁড়ায় : তা হলো মার্কসীয় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত বিষয়বস্তু, তার বস্তুবাদী চরিত্র এবং নিয়ন্ত্রিত ক্রমাগ্রসরণের বাস্তব ভিত্তিতে তার দৃঢ় প্রত্যয়।

সার্ত্র লিখেছেন : "আমরা বিশ্বাস করি যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদেই ইতিহাসের একমাত্র বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ; এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করি যে অস্তিত্ববাদই বাস্তবের স্বরূপ নির্ণয়ে একমাত্র কার্যকরী পন্থা।" সাত্র অস্তিত্ববাদের দ্বারা মার্কসবাদের পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জ্ঞানের মূর্ততা (concreteness) সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক দাবিটা যোগ করে দেন। ক্রমাগত

জোর দিয়ে তিনি তাঁর পাঠক সমাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে মার্কসবাদে মূর্ততার অভাব, মার্কসবাদ বিমূর্ত ও বর্গীকরণ-প্রবণ, এবং এতে বাস্তবকে অতি সরলীকরণের ও যুক্ত্যাভ্যাসের (rationalisation) ঝোঁক প্রবল।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিশেষকে নির্বিশেষে, মূর্তকে অমূর্তে পরিণত করার যে মূল অভিযোগগুলো সার্ত্র করেছেন, তিনি যতই সেগুলো 'প্রমাণ' করছেন, ততই তাঁর অভিযোগের চরম ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদের একটি প্রাথমিক সূত্র হলো এই যে সত্য মাত্রেই মূর্ত। প্রথমে একটিমাত্র দেশে সর্বহারা বিপ্লবের জয়লাভ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনের জন্য লেনিনবাদী পরিকল্পনার ভিত্তিমূলে যে সাম্রাজ্যবাদী যুগের এবং রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার বাস্তব লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ ছিল না—এমন কথা কি বলা যায় ? এ কি সত্য হতে পারে যে জনগণতন্ত্রী দেশসমূহে কমিউনিস্টদের নীতি ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে জটিল ও বিশেষ পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হয় নি ? বিশেষ কোনো দেশে কোন্ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে তা সে দেশের ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে—এই গভীর উপলব্ধিই যে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণার উৎস নয়—এটা কি খাঁটি কথা ? সার্ত্র বিলাপ করেন যেন মার্কসপন্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বাস্তব বিচারপদ্ধতির অভাবের দরুণই বর্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, "উপলব্ধি ব্যতিরেকেই ইতিহাস সংঘটিত হচ্ছে।" ঐতিহাসিক স্বতঃস্ফূর্ততার পরিবর্তে ইতিহাস-চেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যে ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, তার সম্পর্কে এত বড়ো ভুল বোঝার অন্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা শক্ত।

অস্তিত্ববাদের সাহায্যে মার্কস্‌বাদকে 'গভীরতর' করার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণের জন্যই সকল প্রত্যক্ষ মূর্ততাকে অস্বীকার করে মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে এই অকারণ অভিযোগ। কিন্তু সার্ত্রের উপস্থাপিত যুক্তির মধ্যেই তাঁর নিজস্ব দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্ভব রহস্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন : "ধনিক ও সর্বহারার শ্রেণী বিরোধে সামাজিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যে কাঠামোর মধ্যে এই কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় বিরোধগুলি তারই পটভূমিকা মাত্র।" অন্যত্র তিনি বলেছেন : "সর্বহারা হলো অমূর্ত ধারণা বিশেষ ; বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে সর্বহারাদের—বহুবচনেই তাদের অস্তিত্ব।" সার্ত্রের পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের চালকশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের মূল বিষয়টাই ঝাপসা

হয়ে যায়। এতে অনতিপ্রয়োজনীয় খণ্ডিত বিষয়সমূহ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পিছনে ঠেলে দেয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানমার্গে অনিবার্যভাবে দুই-ই থাকে—সাধারণীকরণ ও পৃথকীকরণ, বহুল পরিমাণে যোজন ও বিযোজন। এই প্রদ্ধতি ব্যতিরেকে বিজ্ঞানচর্চা বা তত্ত্বগত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্ভবপর নয়। সর্বহারা আর বুর্জোয়া পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র—এ সবই হলো বৈজ্ঞানিক অমূর্ত ধারণা (abstraction) অর্থাৎ বাস্তবজীবনের বহুবৈচিত্র্যের বিষয়মুখ সার সত্যের যুক্তিসিদ্ধ প্রতিফলন। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক ধারণাবলী হলো সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের যুক্তিজাত নির্দেশ সমূহ (logical co-ordinates)। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সহায়তায় নানা ধরনের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে এগুলির প্রয়োজন হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রয়োগশীল কর্মসাধনে। এদের অবহেলা করে ইন্দ্রিয়লব্ধ অব্যবহিত উপাত্তে পর্যবসিত করার অর্থ হলো সামাজিক কর্মধারাকে দিক্‌ভ্রান্ত করা ও পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলা। সার্ত্র-এর চিন্তা পদ্ধতি ঠিক এতেই পর্যবসিত হয়। শ্রেণী-সংগ্রামে জাতিগত পার্থক্য সমূহের অন্তরালেও যে আন্তর্জাতিক সর্বহারার স্বার্থগত ঐক্য রয়েছে তা তিনি দেখতে চান না; বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন স্তরের অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে সে-যুগের প্রধান সংগ্রামী বৈপরীত্যের অস্তিত্ব আছে, সেদিকে তিনি চোখ বুঁজে থাকেন। এর মধ্য থেকেই আসে তাঁর আহ্বান—মার্কস্‌বাদকে অস্তিত্ববাদের স্তরে 'উন্নীত' করার। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার একমাত্র অর্থ হলো মার্কস্‌বাদকে বিসর্জন দিয়ে এমন এক বিশ্বদৃষ্টি অবলম্বন করা যার কাঠামোতে ব্যাপক ঐতিহাসিক দিগন্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রবেশ নিষেধ।

মার্কস্‌বাদের অমূর্ততার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার প্রকৃত অর্থ হলো মার্কস্‌বাদী বিশ্বদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক চরিত্রের সমালোচনা করা। সাত্র দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেছেন বিধিবদ্ধতার আনুগত্যকে, যাতে আছে দুই-ই, সাদৃশ্য ও পুনরাবৃত্তি। তিনি বলেন: "দ্বান্দ্বিক দর্শন পূর্ব-নিরূপণবাদ (Determinism) নয়।" বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে এবং পরিবর্তন ক্রিয়ার মূলে আছে যে অভিন্নতার অস্তিত্ব তাকে উপলব্ধি না করেই তিনি মার্কস্‌বাদকে দোষ দিয়ে বলেন যে মার্কস্‌বাদ উপলব্ধিকে বৈজ্ঞানিক পূর্ব-নিরূপণবাদের স্তরে নামিয়ে এনেছে। অস্তিত্ববাদীদের এটা কখনোই খেয়াল হয়

নি যে মার্কস্‌বাদ ইতিহাসের উপলব্ধিকে বৈজ্ঞানিক সঠিক নিরূপণবাদের স্তরে উন্নীত করেছে অর্থাৎ ইতিহাসকে স্বীকার করেছে নিয়ন্ত্রিত ধারা হিসাবে এবং আবিষ্কার করেছে নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী। মার্কস্‌বাদ ও অস্তিত্ববাদের মূলগত বিরোধ, বিশ্বদৃষ্টি হিসাবে তাদের বৈপরীত্য, এবং তাদের কোন্‌টি বিজ্ঞান-সম্মত ও কোনটি বিজ্ঞান-বিরোধী তার পরিচয় এখানেই পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধিকে সার্ত্র কোন্ লক্ষ্যপথে মূর্ত করে তুলতে চান? তিনি অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন: "আমরা তৃতীয় কোনো পন্থার নামে অথবা ভাববাদী মানবিকতার খাতিরে মার্কস্‌বাদকে বিসর্জন দিতে চাই না; আমরা যা চাই তা হলো মার্কস্‌বাদের নিজের মধ্যেই ব্যক্তির অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।" তাঁর ভাষায় "সমকালীন মার্কসীয় দর্শন ব্যক্তিজীবনের সমস্ত বাস্তব নিরূপণকে বাদ দিয়েছে।...এর ফলে ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে উপলব্ধিকে মার্কস্‌বাদ সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছে।" তাঁর মতে মার্কসীয় সামাজিক বিমূর্ততার মধ্যে ব্যক্তির মূর্তরূপ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আর তাই মূর্ত ব্যক্তির অধিকার পুনঃস্থাপনার নামে তিনি যার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হলো নৃ-বিদ্যা-বাদ (anthropologism)।

কিন্তু ফয়ারবাখের মতাদর্শের মার্কসীয় সমালোচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে anthropologism-এর দুর্বলতার উৎসটা কোথায় তা সুবিদিত। সর্বোপরি এ হলো, জৈবিক সত্তা হিসাবে মানুষের সম্পর্কে নৃ-বিদ্যা সম্মত উপলব্ধির বিমূর্তীকরণ, মূর্ত ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য হিসাবে নয়। ফয়ারবাখের শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই মার্কস্ বিশেষভাবে তাঁর বক্তব্য হাজির করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সার্ত্র মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে স্থাপন করতে চান মানব সম্পর্কে মার্কস্-পূর্ব নৃ-বিদ্যাবাদী ধারণার পুনঃপ্রবর্তনকে।

সার্ত্র তাঁর নৃ-বিদ্যাবাদকে বেশ ফ্যাশন দুরস্ত আপাত-বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে কাজে লাগান। পাভলভের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ঘৃণাসূচক মন্তব্য করেন এবং মনঃসমীক্ষণকে সংহত রূপ দেবার জন্য ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের দ্বারা মার্কস্‌বাদকে 'গভীরতর' করতে চান। মনঃসমীক্ষণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধী বলে মার্কস্‌বাদী যে মত, সার্ত্রের মতে তা ভ্রান্তি বিশেষ। তাঁর মতে শৈশবে ব্যক্তিত্ব গঠনের গোপন রহস্যগুলি আবিষ্কার করে মনঃসমীক্ষণ ব্যক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের চালকশক্তির উপলব্ধিকে মূর্ত করে

তোলে। তিনি বলেন: "সমকালের মার্কসপন্থীদের শুধু বয়স্কদের নিয়েই কারবার।" আর বয়ঃপ্রাপ্ত হিসাবে মানুষগুলো জেগে স্বপ্ন দেখে না।

এই তিরস্কারের অসারতা ও অবিশ্বাস্যতা প্রমাণ করার আবশ্যক নেই। এটা পরিষ্কার যে শিশু-মনস্তত্ত্ব চর্চা কোনো কাজে লাগে কিনা—সেটা আলোচ্য বিষয় নয়; বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে এই চর্চা করা হবে, না দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী ফ্রয়েডবাদের ভিত্তিতে করা হবে, সেটাই বিবেচ্য। তা ছাড়া মতানৈক্য শিশু-মনস্তত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব নিয়ে নয়, সামাজিক বিধিবদ্ধতা (regularity) ও সমাজজীবনে মনস্তত্ত্ব-শারীরবিদ্যাসম্মতবিধিবদ্ধতার (regularity)-র সম্পর্কটা নিয়ে। মনস্তত্ত্ব-শারীরবিদ্যাসম্মত নিয়মাবলী সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এমন কি তাদের নিজেদের পরিবর্তনও সামাজিক কর্মধারার উপর নির্ভরশীল।

সার্ত্র অবশ্য মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের সমন্বয় এবং মনঃসমীক্ষণের সংহতি-সাধন নিয়েই সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে মার্কসপন্থীরা যাতে চূড়ান্ত উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্য অন্য একটি বুর্জোয়া ভাবধারা—সূক্ষ্ম (micro) সমাজবিজ্ঞানকে আত্মস্থ করা দরকার। আমাদের বলা হয় যে সমাজ-সংগঠন, শ্রেণী, উৎপাদনের সম্পর্ক, বনিয়াদ ও উপরি-সৌধ ইত্যাদি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুপযুক্ত, অমূর্ত এবং সমাজজীবনের পূর্ণতা উপলব্ধির পক্ষে অক্ষম। 'মানবিক সম্পর্কের' সমাজতত্ত্ব ও 'দল'-ভিত্তিক (আঞ্চলিক, পারিবারিক, বিবাহসম্বন্ধীয় ইত্যাদি) সমাজতত্ত্বের সাহায্যে একে পূর্ণতর করে তোলা দরকার। সার্ত্রের মতে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে গঠিত এই মানব-নির্মাণবিদ্যাকে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু নিছক ঘটনা হলো এই যে বুর্জোয়া ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রিত সমস্ত 'মানবিক সম্পর্কের'-র সমাজতত্ত্ব মানবসমাজের শ্রেণীভিত্তিক গঠন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে। শ্রেণী সম্পর্কে চূড়ান্ত ও মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'দল-সংগঠনে'র বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মানব-নির্মাণবিদ্যাকে' বসানো হয়েছে রণনীতি ও কৌশলের স্থানে। সম্পত্তি-ভিত্তিক শ্রেণী সম্পর্ককে সম্ভাব্য সকল দলের ও পৃথক পৃথক ব্যক্তির অগণ্য সম্পর্কের মধ্যে একটিমাত্র বলে গণ্য করা হয়েছে।

এ রকম 'সংহতির' পরে মার্কসীয় শিক্ষা নিশ্চয়ই যুক্তিবাদবিরোধী, নৃবিদ্যা-

সম্মত, মনঃসমীক্ষণভিত্তিক ধারণাবলীর অস্পষ্ট পটভূমি কিংবা যান্ত্রিক কাঠামোয় পর্যবসিত হবে। এই জাতের সংহতির পরে মার্কসবাদ তার বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক বিষয়সার হারিয়ে একটা ম্লান ছায়া ও শূন্যগর্ভ শব্দ হিসাবেই টিকে থাকতে পারবে।

কথায় বলে ঘোড়ার চলন খুরে আর চিংড়ির চলন দাঁড়ার মুখে; আঁরি লেফেভ্‌র্ মার্কসবাদ থেকে অস্তিত্ববাদের দিকে ঝুঁকেছেন। অবশ্য তিনি নিজেকে মার্কসপন্থী বলেই জাহির করেন। 'প্রকৃত' মার্কসবাদ অর্থাৎ মার্কসের নিজের মার্কসবাদে পুনরাবর্তনের এবং 'সংকীর্ণ মতবাদের ঘুম' থেকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি মার্কসবাদের উপর যে সব অস্ত্রোপচার চালাচ্ছেন, তাতে মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ বিকৃতই করা হবে।

লেফেভ্‌রের মত হল এই যে দার্শনিক বস্তুবাদ সমাজপদ্ধতির ভিত্তিতে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিকচিন্তার সমগ্র বিবর্তনের পরিণতি বা সামগ্রিক রূপ নয়। বস্তুবাদ তাঁর কাছে একটা 'দার্শনিক স্বীকার্য' মাত্র। বস্তুবাদের সূত্রগুলি আলোচনার প্রারম্ভে উপস্থাপিত প্রাথমিক বক্তব্য ছাড়া বেশি কিছু মনে হয় না—সেগুলি কোনো ক্রমেই প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এই সূত্রগুলি শুধু যে অপ্রমাণিত তাই নয়, এগুলিকে প্রমাণ করাও যায় না। লেফেভ্‌র লিখেছেন: "বস্তুবাদকে কখনো যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না—যেমন ভাববাদকেও। বিরুদ্ধ ধারণা দুটিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা এবং তাদের বৈপরীত্যটা দেখানো যেতে পারে, শুধু এইটুকুই।" আর যেহেতু ভাববাদকে বস্তুবাদের মতোই প্রমাণ করা যাবে না, সুতরাং লেফেভ্‌রের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদও সমান অখণ্ডনীয়। "তাই কেউ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, কিন্তু একে বিধ্বস্ত বা খণ্ডন করতে পারে না। নূতন নূতন রূপে ভাববাদ আবার দেখা দেয়। কোনো 'স্বীকার্যকে' কি ভাবে বিধ্বস্ত বা খণ্ডন করা যাবে? একই ভাবে বস্তুবাদের সারবত্তাকেও প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।"

দর্শনের মৌলিক প্রশ্নে, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান-সম্মত সাদৃশ্য আবিষ্কার এবং তাদের বিরোধের অনিবার্য পুনরাবৃত্তিতেই লেফেভ্‌রের বিশ্বাস। ভাববাদের যুক্তিসিদ্ধ, তথ্যগত ও ব্যবহারিক অসারতা

এবং বস্তুবাদের প্রশ্নাতীত কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেক বস্তুবাদী দার্শনিক একমত হলেও তিনি তা অস্বীকার করেন। বস্তুবাদ (ভাববাদের বিপরীতক্রমে) বাস্তবিকই অখণ্ডনীয়। তার কারণ এ নয় যে এটা প্রমাণ করা যায় না। সত্যই কথার কসরতিতে একে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু বস্তুবাদ অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক নূতন সামাজিক কীর্তি, প্রত্যেক নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সামগ্রিক উন্নতির দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বার বার এর প্রমাণ হয়ে চলেছে। বস্তুবাদের সত্যের মতো কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যই এত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

ভাববাদের যে বার বার পুনর্জন্ম ঘটে তার সমগ্র কারণ এ নয় যে ভাববাদ অখণ্ডনীয়। বিজ্ঞানের ও দর্শনের এবং সমাজ-বিবর্তনের সমগ্র ইতিহাস আসলে ভাববাদ খণ্ডনেরই ইতিহাস। খণ্ডন হওয়া সত্ত্বেও ভাববাদ ও তার রক্ত-সম্পর্কাবদ্ধ অগ্রজ ধর্ম এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বস্তুবাদ শুধু যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণাবলী এবং বঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভ্রান্তিসমূহের টিঁকে থাকার ক্ষমতাটা সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় তাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যাও করে।

দর্শন-সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নে লেফেভ্‌রের সূত্রের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো মিল নেই। এ হল দর্শনের পূর্বালোচিত মৌলিক প্রশ্নের ব্যাপারে প্রকাশ্যে সূত্ররচনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের পথ থেকে সমকালীন ভাববাদের লক্ষণাক্রান্ত অপসরণের দৃষ্টান্ত। "অগ্রগামীদের চিন্তার মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের প্রাচীন বিরোধের অবসান হয়ে গেছে" বা বিরোধ "অদৃশ্য হয়ে গেছে, কারণ এর আর কোনো অর্থ নেই"—এই জাতীয় যে সব বক্তব্য লেফেভ্‌র উপস্থিত করেছেন, তাতে এবং তাঁর "একযোগে ভাববাদী ও বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যাকে বিসর্জন দেওয়ার" আহ্বানে এটাই প্রমাণ হয় যে তিনি ভাববাদী প্রতিক্রিয়ার বূ্যহরক্ষায় শাস্ত্রী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরীদের লেনিন যে নাম দিয়েছিলেন, তা নির্ভুল—নামটা হল দার্শনিক অস্থিত বুদ্ধি।

দ্বান্দ্বিক দর্শনের বাস্তব সূত্রগুলি সম্পর্কে লেফেভ্‌রের যে বিচার তার সঙ্গে মার্কস্‌বাদের বিরোধের প্রসঙ্গে এখানেই থামা যাক। তাঁর চোখে বস্তুবাদের মতোই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিও ফলপ্রদ প্রকল্পমাত্র, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। তিনি বলেন: "একে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত চূড়ান্ত সত্যে উন্নীত করার কোনো

অধিকারই আমাদের নেই।" তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে একে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সমূহের মাটিতে উদ্ভূত বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রকাশ যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনায়, দ্বান্দ্বিক দর্শনকে নিন্দিত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এই সব ভুয়ো যুক্তি প্রত্যক্ষত তাদের বিরোধিতা করছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি যে আধিবিদ্যক বিশ্বোপলব্ধিতে ভাঙনের পর ভাঙন এনেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বস্তুবাদী-দ্বান্দ্বিক দর্শনে এই সকল আবিষ্কারের সাধারণীকরণ সাধিত হয়েছে এবং তাদের দার্শনিক সত্যের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। আমাদের যুগের এই সকল আবিষ্কার অধিবিদ্যা-প্রসূত চিন্তার ক্ষেত্রে চরম আঘাত হেনেছে; এ চিন্তা যদি টিঁকে থাকেই, তবে তা (ভাববাদের মতোই) থাকবে তথ্যগত বিরোধিতা সত্ত্বেও। লেনিন সুন্দরভাবে একে উপলব্ধি করে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর লেফেভ্‌র মার্কস্‌বাদের বিশ্বাসহন্তা হয়ে এটা বুঝতে চান না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শোধনকার্যে লিপ্ত থেকেও লেফেভ্‌র এমন কথা ঘোষণা করেছেন যেন শোধনবাদের ধারণার মধ্যে কোনো "বস্তুগত সারপদার্থ নেই", যেন "লেনিন নিজেও মার্কসের বক্তব্যকে শোধন করেছিলেন!" তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক বিধিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কস্‌বাদের পূর্ণতার দিকে অভিযাত্রা এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক সূত্রগুলির পরাজয়-সাধনের চেষ্টার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য আছে, তা যিনি দেখতে চান না, তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই মার্কস্‌বাদী শিবিরের বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

প্রয়োগবাদী ও অস্তিত্ববাদী এবং ক্যাথলিক যাজক ও দলত্যাগী সাম্যবাদী—দার্শনিক ভাববাদের সমস্ত সম্প্রদায় ও প্রতিনিধিবর্গ তাদের নানা মতপার্থক্য সত্ত্বেও একটা মার্কস্‌বাদ-বিরোধী মোর্চায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দর্শন জগতে বর্তমান যে সংঘাত—এটা তার একটা বিশেষ লক্ষণও বটে। তাদের নিজেদের মতপার্থক্যের ব্যাপারটা আসলে হলো মার্কস্‌বাদ-বিরোধী নানা অস্ত্রের ভিত্তিতে কাজ ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপার মাত্র। জাতিগত দার্শনিক ঐতিহ্য ও বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী তারা পৃথক পৃথক পথে কাজ করে চলেছে। কিন্তু তারা একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল কাজই করছে—তা হলো অগ্রবর্তী বৈজ্ঞানিক ধারণাবলীর বিরোধিতা করা।

বর্তমানে আমাদের মতাদর্শের যে যে অংশ সবচেয়ে কম শক্তিশালী, আমাদের প্রতিপক্ষ সেখানেই শক্তি সমাবেশের চেষ্টা করছে। আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে সব বিচ্যুতি রয়েছে, তারই সুযোগ নিয়ে ওরা পরগাছার মতো বেঁচে আছে।—সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে তারা আশ্রয় করছে, অবশ্য ততদিন, যতদিন না সেই আবিষ্কারগুলি বস্তুবাদী দর্শনচিন্তার সাহায্যে আমরা আয়ত্ত করতে পারছি। বিরোধী পক্ষকে আমাদের চিনে নেওয়া উচিত—তাদের ছল-কৌশল সমূহকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য, বিজ্ঞান-উত্থাপিত নব নব প্রশ্নের আশু উত্তরদানের জন্য এবং জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য এটা করা দরকার।

"কমিউনিস্ট" (১৯৬১, সংখ্যা ১) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল রুশ প্রবন্ধের নীরেন্দ্রনাথ রায় কৃত ইংরাজি ভাষান্তরের বাংলা অনুবাদক : বেদুইন চক্রবর্তী। ইংরাজি ভাষান্তরটি রচিত হয়েছিল ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে, কিন্তু নানা আকস্মিক ঘটনায় বাংলা অনুবাদটি এর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

ভ্রম সংশোধন

পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছাপা হয়েছে	হবে
৬১৫	১৯	তানের	তালের
৬২৫	২৩	গজেন্দ্রনাথ	গনেন্দ্রনাথ
৬২৬	১৩	সপৈ	সর্পৈ
৬২৬	২৯	তাল	তান
৬২৮	২৭	সুধীরকুমার নাথ	সুধীরকুমার নান

এই সংখ্যায় ৭৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনার শিরোনামা ভুল ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে : যাত্রার পথে : মস্কো-লেনিনগ্রাদ

সুলেখা সান্যাল : জীবন ও সাহিত্য

তরুণ সান্যাল

জীবনের ঘটনা কখনও কখনও কপোলকল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, নইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জাত সুলেখা সান্যালের জীবন এত আশ্চর্যজনক হবে কেন। বহুবার আমার মনে হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্র ও জীবনের বহু মিল আছে, তাঁর সাহিত্য যেন আত্মজীবনীমূলক। তবুও শিল্পকে যদি জীবনের চেয়ে বড়ো বলেও মানি, সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিজীবনের পাদপীঠে তাদের ম্লান বলেই মনে হবে। বিশেষত তাঁর ১৯৫৮ সালের পরবর্তী রচনাসমূহে এত বেশি পরিচিত মানুষের মিছিল দেখা গেল যে, আমি সুলেখা সান্যালের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম বলেই তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মকে প্রায় আত্মজীবনী রচনা বলে মনে হয়েছে। এসব কথা আজ যদিও মনে পড়ছে, তথাপি যাঁকে 'সুলেখা দি' বলে ডাকতুম সেই অতি পরিচিত লেখিকাকে অনেক লেখক-লেখিকাদের থেকে তফাৎ করে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তিনি জীবনের শেষ দিকে কলকাতার পরিচিত সাংস্কৃতিক সমাজ থেকে এত দূরে এবং এত বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করতেন যে নানা সংঘর্ষ ও নিন্দাপ্রশংসার বাইরে সাহিত্যকর্ম, কেবলমাত্র জীবন ও সাহিত্যের জন্য বেঁচে থাকতে, তিনি মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য মানসিক শক্তি নিয়ে আত্ম-পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। শ্রীযুক্তা সুলেখা সান্যাল দুরারোগ্য লুকোমিয়া বা রক্তের কর্কট রোগে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বর্ধমানে তাঁর পিত্রালয়ে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাহিত্যকর্মীর সাহিত্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, একথা মেনে নিয়েও আমরা বলব, সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে তাঁর আত্মজীবনের বহু ঘটনার বিম্বন দেখা যায়। সুলেখা সান্যালের অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে ভাগ্যের সঙ্গে দ্বৈরথে শ্রীযুক্তা সান্যাল পরাজয় স্বীকার করেন নি; সেই ভাগ্য যদি পুরুষশাসিত—কী প্রচলিত, কী প্রগতিশীল—সংস্কৃতিসেবীদের বিচারের শেষ পর্যন্ত মানদণ্ড হয়ে থাকে, তবে কলুষকল্মষসাপেক্ষ মধ্যযুগ এবং

লোভ চরিতার্থ করার মূলধনাশ্রয়ী মনই জয়ী হবে। স্থলেখা সান্যালের রচনাই তাঁর জীবনের বিপ্লববার্তা বলে গণ্য হোক, অন্তত আমি সে কথা সর্বদাই মনে রাখব।

স্থলেখা সান্যাল ১৯২৮ সালের ১৫ই জুন (১লা আষাঢ়, ১৩৩৫) অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি গ্রামে ক্রমক্ষীয়মান জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দু পুরুষ আগে এঁদের কয়েকটি নীলকুঠিও ছিল। কিন্তু তাঁর শৈশবে আর সেই পরিবারের পুরাতন মহিমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না বললেই চলে। শিক্ষক জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেমন ব্যক্তিজীবনে তাঁকে শিক্ষা-জীবনের সরল নিষ্ঠা দান করেছিলন, তেমনি মাতৃকুলের ধারায় রামতনু লাহিড়ীর ঐতিহ্যপূত অচলায়তন ভাঙার তরঙ্গভঙ্গও সে চরিত্রে দাগ রেখেছিল। তাছাড়া, কোঁড়কদি গ্রামটিরও বৃটিশরাজের পুলিশের খাতায় বিপ্লবী ও 'স্বদেশী'দের ঘাঁটি বলে নাম ছিল। উত্তীর্ণ কৈশোরে স্থলেখার, অগ্রজদ্বয় এবং তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের নিকটে নতুন সমাজগত দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

স্থলেখা সান্যালের বাল্য ও প্রথম কৈশোর কাটে চট্টগ্রামে পুত্রকন্যাহীন মাসিমার নিকটেই। যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি'তে তাঁর সাহিত্যজীবনের হাতে খড়ি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীশচীন মিত্র (এঁদের দুজনকেই স্থলেখা সান্যালের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ' উৎসর্গীকৃত) তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম উৎসাহদাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রথমে ভিক্টোরিয়া পরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়েন। এম. এ.তেও ভর্তি হয়েছিলেন তারপর কিন্তু পাঠ সম্পূর্ণ করেন নি। ১৯৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর নানাকারণে সুখের হয় নি।

কৈশোরেই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ১৩৫১ সালে 'অরণি'তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'পঙ্কতিলক'। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, এবং নির্যাতন ভোগও করেছিলেন। স্থলেখা সান্যালের ১৯৫৪ সালের পূর্বের রচনাগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জনজীবনের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গ-বিভাগের ফলস্বরূপ ছিন্নমূল পিতৃপরিবার ও বাঙালী জীবনের নিদারুণ দুর্ভোগ তাঁকে জীবনের কঠিন পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। কলকাতায় শিক্ষয়িত্রী হিসাবে

নিদারুণ সংগ্রামে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংযুক্ত থেকে তিনি কখনই সাহিত্যশিল্পকে বর্জন করেন নি বরং বাঙালী সংগ্রামশীল নারীর অনন্য অভিব্যক্তি তিনি নানা কাহিনীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

স্থলেখা সান্যালের সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই নারী চরিত্র। যারা সামাজিক বিচারে, অর্থনীতির হাটে উপযুক্ত মূল্য না পেলেও হেরে যায় না। সম্ভবত এই বিচারে স্থলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পপুস্তকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ('সিঁদুরে মেঘ' নামে গল্পটি জনৈক চিত্রপরিচালক ব্যবহার করবেন বলে ইতিপূর্বেই কনট্রাক্ট করেছেন)।

স্থলেখা সান্যালের সাহিত্যকর্মকে মোটা দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁর ১৯৫৪ সালের রচনাগুলি পড়ে। এই রচনাগুলির চরিত্র তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'নবাঙ্কুরে' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭, নয়া প্রকাশ) এবং গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ'-এ স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। নবাঙ্কুর-এ নায়িকা বালিকা ছবির ক্রমে ঘাতপ্রতিঘাতে যুবতী হয়ে ওঠার কাহিনী। ভেঙে পড়া একান্নবর্তী বনেদী পরিবারের মেয়ে ছবির গ্রামের স্বদেশী অধীর কাকার সাহচর্যে, মা মমতার বেদনায় অভিষিক্ত হয়ে, লেখাপড়া শেখবার জন্য পিশিমার সঙ্গে শহরে যাওয়া, তারপর গ্রামে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রভৃতি দিকগুলি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে। 'নবাঙ্কুর' স্থলেখা সান্যালের একটি অত্যাশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'সিঁদুরে মেঘ'-এর গল্পগুলির মধ্যে অবিস্মরণীয় নাম-গল্পটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার মালতী ও অনন্ত ঘর বেঁধেছে। দুজনেরই অতীত জীবনে দুঃখ ছিল। মালতী যক্ষারোগাক্রান্ত বাবাকে ও সংসার বাঁচাতে কালো ধলা অফিসারের লোভের শিকার হয়েছিল। অনন্ত তার আগের বউটিকে কনট্রাক্টের লোভে কর্তব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। দু জনের সম্পর্কের মলিনতা দুজনেই চোখের জলে ধুয়ে দেয়, নায়ক অনন্ত বলে, "তুমি তো দেখেছ, রাতে ঘুমোইনে আমি। ঘুমোব কি—? শান্তি পাইনে যে। এমন ভয় ধরে গেছে মনে। উঠে তোমাকেই পাহারা দিই···গাছটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলেই তো চারাটাকে আরও সাবধানে রাখতে চাই।" 'জীবনায়ন' গল্পের নায়িকা সীমা বেকার স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম। দুঃখের সংসারে আগন্তুক শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ঘর থেকে একদা বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে লতা (অন্তরায়) এবং 'ছোটমাসী'র (ছোটমাসী) নতুন

মর্যাদা আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্য একটি দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে। ঘর থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মা তার শিশুটিকে ('আমার মানিক সোনারে পিস্তা মারল কেন অরা? আমি পারি নাই রাখতে') জেলখানায় বন্দিনী মায়ের ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মধ্যে ফিরে পায় (জন্মাষ্টমী)।

এককথায় বলতে গেলে স্বলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' বইখানি বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'নবাঙ্কুর', 'সিঁদুরে মেঘ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম ধারার উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কথা প্রসঙ্গত বাদ দেওয়াই ভালো। বিশেষ ভাবে ১৯৫৬ সালের পরবর্তী বহু ঘটনাই নানা ব্যক্তির মনঃপূত না হবারই কথা। তবে একথাটি বলা ভালো যে, কার্যত এ সময়েই তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি বর্ধমান জেলায় বড়শুল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগ দেন। সম্ভবত স্বলেখা ব্যক্তিজীবনের এ সময়ে এমন ভুল করে বসেছিলেন যে ভুল শোধরাবার আর এ জীবনে অবসর হলো না। কিন্তু ভুল করেছিলেন বলেই বোধ হয় ভালোবাসা, প্রীতি, ঘৃণা নামক মানবিক যে বোধগুলিকে তিনি পূর্বতন রচনায় বিচার করেন নি, সেগুলিকে নতুন করে তাঁর বিচার করতে হলো। এতে তাঁর ব্যক্তিজীবনে কী লাভ লোকসান হলো তা তিনিই শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এই প্রচণ্ড ব্যর্থতা থেকেই পেলাম।

শ্রীযুক্তা সান্যালের ১৯৫৭ সালে লিউকোমিয়া রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তারদের মতে, অন্তত আরও দু বছর আগেই এ রোগের আক্রমণ হয়েছিল ১৯৫৫ সাল থেকে। তখন পর্যন্ত তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কোনও রচনা প্রকাশ করেন নি, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে তিনি তখন অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লুকোমিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করেন। ভারতসরকারের পাশপোর্ট দপ্তর অতিক্রুত তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। মিসেস কস্টের অধীনে তিনি মস্কোয় লেনিন হাসপাতালে চিকিৎসিত হন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মহামতি লেনিনের শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার হয়)। সোভিয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণা বিভাগ ও ভারতীয় ছাড়পত্র

দপ্তর স্বলেখা সান্যাল ও তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের নিকটে এজন্য ধন্যবাদার্হ।

মস্কোয় তিনি নিরাময়ের দিকেই চলেছিলেন, সেখানে পেয়েছিলেন সোভিয়েত কর্মীদের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি। শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীযুক্তা সান্যাল তা স্মরণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অসামান্য। নিরাময়ের পূর্বেই তিনি ভারতভূমিতে ফিরে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের হেমাটোলজির অধ্যাপক ডঃ জে. বি. চ্যাটার্জির চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি মস্কোতে ছিলেন।

মৃত্যুর কালো ছায়ার নিচে থেকেও স্বলেখা সান্যাল জীবনের প্রতি মমতা হারান নি। যেন মৃত্যুকে পরাভূত করবার জন্যই তিনি ১৯৬১ সালে বি. টি. ডিপ্লোমার অধিকারিণী হলেন ; ১৯৬২ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি পান। তিনি এম. এ. পরীক্ষা দেবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাঝে মাঝে রক্ত পরিবর্তন করে যাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অদম্য মনের শক্তির জোরে ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যুকে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

মস্কো থেকে ফেরার পর স্বলেখা সান্যাল কলকাতার সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে প্রায় নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অতি শুভানুধ্যায়ী অনেকেই তাঁর সংবাদও ভুলে গেছেন। তাঁর অতি পরিচিত সাহিত্য সহকর্মীর অনেকে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ দিকের বহু তথ্যই জানি বলে। জানি, কী নিদারুণ বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। দ্রুত অপস্রিয়মান জীবনের রৌদ্রটুকু ধরে রাখার জন্য তাঁর আকুতি মার্জিত একটি ছোট্ট পরিবেশে কেমন জড়িয়ে রেখেছিল!

মস্কো থেকে ফেরার পর তাঁর যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 'দেয়াল পদ্ম' (মানসী, শারদীয় ১৩৬৮) উপন্যাসটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এতদিনে তিনি তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এতে কোথাও ধরা পড়েছে কিনা জানি না, কিন্তু কেবল যে পুরুষই নয়, নারীও যে মানবিক বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত তা তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। পুরুষকার এবং নারীত্ব উভয়ই যেন যথাক্রমে নারী তত্ত্ব সন্ধানে

এবং পুরুষের রৌপ্য অনুসরণে ব্যয়িত হতে চলেছে। অনেক সময় মানুষ ঘটনাক্রমে শিকার হয়ে পড়ে। তবু সে ঘটনাগুলি যে অপরের জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। জীবনের প্রবাহ নানা ধারা-উপধারায় কখনও সংঘর্ষে, কখনও মিলিত প্রধাবনে বয়ে চলেছে: মানুষ যেন তার আপাত বহিরঙ্গ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। সুলেখা সান্যাল যেন শেষ জীবনে পলকের জন্য জীবনের ধারাপ্রবাহের মেলবন্ধনটি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ব্রহ্মবাদিনীদেরই একমাত্র আয়ত্তাধীন। 'উলুখড়', 'একটি মামুলি গল্প', 'খোলা চিঠি', 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রভৃতি আত্মবিশ্লেষণ-মূলক গল্পগুলির পরিণতি 'দেয়াল পদ্ম'। 'দেয়াল পদ্মে'র নায়ক সঞ্জয় নায়িকা 'অসীমা'র ভগ্নিপতি। অসীমা ডাক্তার। অসীমা মধ্যপ্রদেশের এক হাসপাতালে কাজ করে তার ব্যর্থ দিনগুলি সেবা দিয়ে ভরিয়ে রাখে। অসীমার পিতৃ পরিবারের ধারণা সঞ্জয় তার স্ত্রীকে খুন করেছে, অথচ শিশু দুটিকে মানুষ হতে দিচ্ছে না। সঞ্জয় পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রী করা টাকায় একটি বিশাল জোতের পত্তন করে, শুকনো মাটিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফসল ফলে না, ঝড় বন্যা অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। অসীমা এসেছিল সঞ্জয়ের কাছে, তার বোনের শিশু দুটিকে নিয়ে যেতে। সঞ্জয় অসীমাকে বলল, তার বোন অর্থ ও শহুরে চাকচিক্যের লোভে তাকে ছেড়ে, শিশু দুটিকে ফেলে একটি আধুনিক চৌকস যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। অসীমাও তার নিজের কথা বলে। বহু কষ্টে কলকাতায় ডাক্তারী পড়া শেষ করে তার দয়িত অশোকের সঙ্গে মিলতে লণ্ডনে যায়। কিন্তু অশোক সেখানে একটি সস্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না-করা ঘর বেঁধেছে। সেই মেয়েটি লরা অশোককে ছাড়ে না, অশোক অসীমাকে কথা দিয়েছিল শুনে বলে, "কথা? কথার কি দাম? তাও ওই বিশ্রী চেহারার মেয়ে! তোমার বন্ধু চন্দ্র চক্রবর্তী কথা দেয় নি আমাকে? তার বাচ্চা ছিল না আমার পেটে?···ওকে দাও না হোস্টেলে পাঠিয়ে।" অসীমা আবার কলকাতায় ফেরে। তারপর দূর দেশে ডাক্তারি।

অসীমা সঞ্জয়ের ভুল বোঝাবুঝির শেষে, অসীমার ফেরার আগের বিকেলে সঞ্জয় অসীমাকে 'দেয়াল পদ্ম' দেখিয়েছিল। এক পোড়ো মন্দিরের শুকনো গা বেয়ে দেয়াল পদ্ম গাছের লতা উঠেছে। "মন্দিরের গায়েই ওর শিকড়টা লাগানো। কে লাগিয়ে ছিল, কবে লাগিয়েছিল কেউ বলতে পারে না; ভীষণ উঁচুতে ফোটে···ও জিনিস নাকি ওই রকম নির্জন আর ঠাণ্ডা আর পোড়ো বাড়ির গা ছাড়া জন্মায় না।"

সুলেখা সান্যাল তাঁর সাহিত্যকে বুঝি ঐ দেয়াল পদ্মই ভেবেছিলেন। নাকি কোনো বাংলা দেশের মেয়ে? তার জীবনের লতাটি কোন পোড়ো মন্দিরের দেয়াল বেয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে ঝরে পড়ে গেল। হায়, লতাটি যে মন্দির বেষ্টন করে উঠেছিল, একদা সে মন্দিরের অন্তরেও বিগ্রহ ছিল। সুলেখা সান্যালের জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন। আমি তাঁর সাহিত্য অন্বেষণ করে মন্দিরের দেবতাটিকে অন্বেষণ করি না, কেন না আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকেই শিখেছিলাম, যে দেবতা জীবনকে স্খলন পতন ত্রুটি সত্ত্বেও ফুটে উঠতে দেন, সেই দেবতা মানুষকে খাটো করেন না, তিনি অমর। তাই বুঝি সুলেখা সান্যাল তাঁর দেয়াল পদ্মের নায়িকাকে অসীমা নাম দিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় যখন তিনি নতুন বাঁকে এসেছিলেন,—যেখান থেকে জীবনের নিগূঢ় অভাবনীয় সত্যেরই অনুভূতি জন্মায়—তখনই অকালে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

স্বকৃত ও অ-স্বকৃত

পরিচয়ের বহু প্রতিশ্রুতির মতোই আমাদের গত ফাল্গুন মাসের প্রতিশ্রুতিও সম্পূর্ণ রক্ষিত হতে পারে নি। সম্প্রতি অবশ্য সে অপরাধ পরিচালকদের উপর সম্পূর্ণ আরোপ না করাও চলে। কিন্তু জরুরী অবস্থার পূর্বেই বহু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, সে জন্যে আমরাই অপরাধী। আগামী কয় মাসের মধ্যে আমরা পূর্ব প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করব—পাঠকদের নিকট এই বলতে পারি। আর একটি কথা, প্রতি মাসেই জানতে পারি—বহু গ্রাহক ডাকযোগে পরিচয় পাননি। বিশেষ অনুসন্ধান করে বুঝেছি—এ অপরাধ প্রায়শঃ আমাদের নয়। আমরা অবশ্য পত্র পেলে পুনরায় প্রেরণ করি, ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু সাধ্যমতো গ্রাহকও যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা অনুগৃহীত হব। যথা, প্রথমত একটু সতর্ক দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করবেন। দ্বিতীয়ত, হয় স্বয়ং নয় কোনো স্বনিযুক্ত ব্যক্তির সহযোগে হাতে হাতে পরিচয় সংগ্রহে উদ্যোগী হবেন। তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।

সুলেখা স্মরণে

ছবি বসু

সুলেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল খুব সম্ভব 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র আপিসে, তার আগেই ওর ছোট গল্প পড়েছি আর বিস্মিত হয়েছি এই নতুন লেখিকাটির ছোট গল্প রচনায় আশ্চর্য নৈপুণ্য আর এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। লেখক সঙ্ঘের দৈনন্দিন কাজের মাঝে দুজনেই একসঙ্গে কাজ করতে করতে কখন যে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি তা আর টের পাই নি।

সে সময় লেখক-সঙ্ঘের পরিচালনায় ছেচল্লিশ ধর্মতলায় বহু সাহিত্য-সভা ঘরোয়া ভাবে অনুষ্ঠিত হতো, ছোট গল্পের আসর এখানে বসেছে বহুবার, লেখকের পক্ষে নিজের লেখা অচেনা পাঠকদের সামনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই এলোপাথাড়ি সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া একটু কঠিন ছিল। সুলেখার ছোট গল্প একবার এইরকম এক আসরে পড়া হয়েছিল (খুব সম্ভব ও নিজে সেটি পড়ে নি)। এই ধরনের সমালোচনা কিংবা তত্ত্বকথার আলাপ আলোচনায় ওকে মোটেই উৎসাহিত হতে দেখি নি বরং তখনকার সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে কে কেমন লিখছে, কেনই বা ভালো লেখা আরও বেশি হচ্ছে না এ নিয়ে ওকে অনেক কথা বলতে শুনেছি। নিছক রোম্যান্টিকধর্মী জোলো ভাবপ্রবণতায় ভরা ছোট গল্প রচনায় ওর অনাস্থা ছিল সুস্পষ্ট।

লেখক সঙ্ঘের ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে এক একদিন ও আমাকে বলত—কাল বিকেলটা আর আপিসে না এসে একটু কাজ করি কি বল? কেমন অর্থপূর্ণ ভাবে নিঃশব্দে হাসত সুলেখা।

একদিন কেন দু-দিন দেখা নেই সুলেখার। আন্দাজে বুঝি কাজ মানে গল্পে হাত দিয়েছে ও।

দু-দিন বাদে এসে কেমন লজ্জিত ভাবে বলে—পরিচয়ের জন্য একটা গল্প লিখলাম। কী জানি ওদের ভালো লাগবে কিনা।

প্রথম দিন থেকেই ওকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে দেখেছি, মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি—জীবনটা যদি একটু অনায়াসলভ্য হতো তবে হয়তো বেশ

ফুরসৎ নিয়ে ভালো করে লিখতে পারতাম, তা নয় বেঁচে থাকবার জন্য শুধু হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো!

এরই মধ্যে সুলেখা বেশ কিছু ভালো ছোট গল্প লিখেছে, ওর জীবনের অভিজ্ঞতায় কুড়োনো পাতাগুলি চিন্তা ভাবনা ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনায় আরও পূর্ণতর রূপদানের জন্য অহরহ ভেবেছে। ওর সে-সব দিনের কিছু কিছু ভাবনার অংশীদার হয়েছি সে-সব দিনগুলিতে।

সে সময়টি বোধহয় ওর উপন্যাস সৃষ্টির প্রস্তুতিপর্ব। পূর্ব বাঙলার এক মধ্যবিত্ত সমাজের একটি কন্যা ওর উপন্যাসের নায়িকা। সমাজব্যবস্থার প্রতিকূল আবহাওয়ার চাপে সে বিপন্ন তবু সে হার স্বীকার করে না। নিজের চরিত্রের এক অসামান্য আত্মপ্রত্যয় কোন্ ফাঁকে সঞ্চারিত করে লেখিকা তার উপন্যাসের নায়িকার মাঝে।

সুলেখাকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ ওর সেই নির্ভীক চরিত্রটি বার বার মনে জাগছে।

সুলেখা সান্যালের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জন্ম: বাং ১৩৩৫ সন, ১লা আষাঢ় ১৯২৮ সাল, ১৫ই জুন।

জন্মস্থান: কোড়কদী (ফরিদপুর)

৭ বছর বয়সে চট্টগ্রামে পড়াশোনা শুরু।

১৯৪২ সালে কোড়কদী প্রত্যাবর্তন, ছোটদের পাততাড়িতে রচনা প্রকাশ।

১৯৪৪ সালে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

১৯৪৬ " ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ.

১৯৪৮ " কারাবরণ

১৯৫২ " স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ.

১৯৫৩-৫৫: খিদিরপুরে শিক্ষকতা

১৯৫৬—আমৃত্যু: বড়শুল (বর্ধমান) বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

১৯৫৮ জুন: মস্কো গমন

১৯৫৯ মার্চ: মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন

১৯৬২ ৪ঠা ডিসেম্বর: রাত্রি ২-৩০ মিনিটে বর্ধমানে মৃত্যু

সুলেখা সান্যালের রচনার অসম্পূর্ণ তালিকা

গল্প

পঙ্কতিলক (অরণি, ১৩৫১)

মা মণি (পরিচয়, চেক ভাষায় অনূদিত)
সিঁদুরে মেঘ (পরিচয়) পরে অন্য কয়েকটি গল্প সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত
ছেলেটা (শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৬৩)
ফাটল (শারদীয় নূতন পত্রিকা)
বিবর্তন (চতুষ্কোণ)
ঘেন্না (অনন্যা)
লজ্জাহর (বলাকা)
ভাঙাঘরের কাব্যি (?)
কিশোরী (শারদীয় বলাকা, ১৩৬৮)
পরস্পর (মানসী, দীপালী সংখ্যা, ১৩৬৮)
খোলা চিঠি (অমৃত, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬২)
একটি মামুলি গল্প (পরিচয় ফাল্গুন ১৩৬৬)
যে গল্পের শেষ নেই (শারদীয় বসুমতী ১৩৬৯)
শক থেরাপী (ধরিত্রী, শারদীয় ১৩৬৯)
প্রতীক (অমৃতবার্তা ?)
পাষণ্ড (অমৃতবার্তা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)
মুকুরের মুখ (অসমাপ্ত)
হৃদয়ের রঙ (অসমাপ্ত)

উপন্যাস

নবাঙ্কুর (প্রথম প্রকাশ, মধ্যবিত্ত শারদীয় ১৩৬২)
১ম সংস্করণ : কার্তিক ১৩৬২
২য় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭
উলুখড় (জলসা, ১৩৬৭)
দেয়াল পদ্ম (মানসী, শারদীয়, ১৩৬৯)
নবাঙ্কুর (২য় খণ্ড, অসমাপ্ত, সামান্যই বাকি ছিল)

নবাঙ্কুর ও সিঁদুরে মেঘ ব্যতীত কোনোও প্রকাশিত গ্রন্থ নেই। সিঁদুরে মেঘও বাজারে পাওয়া যায় না।

'ঘাসফুল' নামে একটি ছোটগল্পের বই কলকাতার একজন প্রকাশকের হাতে আছে। সম্ভবত বইটি প্রকাশিত হবে।

বাংলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ কানাইবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র পড়িলাম। খুবই আনন্দের কথা যে তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন হইতেছে ও সেই উপলক্ষে তিনি তাঁহার অনুবাদের কিছু কিছু রদবদল করিতেছেন।

এই তো সুন্দর সুযোগ। ফাউস্ত-এর অনুপম লিরিকগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইতেছে তাহাদের বিভিন্ন স্তবক-গঠনপদ্ধতি যাহা গ্যোতে-র শিল্প প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ। বাংলা অনুবাদে তাহাদের অনুসরণ করার প্রচেষ্টায় কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। আর এরূপ ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কি যে এই প্রচেষ্টায় অনুবাদের খাঁটি বাংলা পদ্ধতির জাতিচ্যুতি ঘটিতে পারে? অলমিতি বিস্তারেণ—

নীরেন্দ্রনাথ রায়

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা (বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৪) 'পরিচয়'-এ 'বাংলা ফাউস্ত' প্রসঙ্গে আমার যে-পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, অনবধানতাহেতু তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল থেকে গেছে। 'পরিচয়'-এর পরবর্তী কোনও সংখ্যায় সংশোধিত হলে সবিশেষ বাধিত হবো।

পৃঃ ৫৫৫

"মরে যাই! ঐ দেখ,
হাঁটছে ডবকা ছুঁড়ী দেখ্, হাঁটে কিবা ঠাটে ভাই!
ওরে আয়, জোরে আয়, উহাদের সাথে মোরা যাই,
তামাকটা কড়া হবে মদ হবে জোরালো বিয়ার,
মেয়ে এক সাজাগোজা পছন্দ এই তো আমার!"

উদ্ধৃতিটির পরিবর্তে হবে :

"চল্ গিয়ে গড়গাঁয়ে হইগে চড়াই,
সুন্দরী মেয়ে আর সেরা মদ ঠিক পাবি ভাই,
আর হবে কী মজাই, হৈ হৈ কতই লড়াই!"

(পৃঃ ৫০)

কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকার জন্য 'পরিচয়'-এ আমার লেখাটি যথাসময়ে দেখতে অসমর্থ হয়েছিলাম। শ্রীযুত কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয়কে ধন্যবাদ, তাঁর ২৯।১২।৬২-তে লেখা চিঠি আমাকে উপর্যুক্ত ভুল সম্পর্কে অবহিত করেছে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

The Exile and the Kingdom—Albert Camus. Penguin Book.

মানুষ তার প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য পায় নি। সে নির্বাসিত। একদিকে অনন্ত, অসীম; অন্যদিকে অপার শূন্যতা। এর মাঝখানে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তার দাহ ও যন্ত্রণা নিয়ে। ইওরোপীয় সাহিত্যে মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা বহুদিন আগে থেকেই চলে আসছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির মূলে এই ধারণার বীজ উপ্ত। যাই হোক পাসকেলের চিন্তায় এই ধারণা রূপ পেল। তারও তিন শ' বছর পরে কির্কেগাড এসে বললেন: "I am no part of a whole, I am not integrated, not included." টমাস উলফ শোনালেন: "Naked and alone we came into exile···which of us has known his brother? Which of us has looked into his father's heart?··· Which of us is not for ever a stranger and alone?" তারপর থেকে নির্বাসন তত্ত্ব সাহিত্য বিশেষে স্থান পেল। আধুনিক বহু ইওরোপীয় লেখকের সাহিত্যে নির্বাসিতের যন্ত্রণা এবং এর জীবনের সার্থকতা হলো মুখ্য বিষয়।

কামুর গল্প সংকলন Exile and the kingdom-এ এই সমস্যাই প্রতিবিম্বিত। বলা যেতে পারে প্রতিটি গল্পের মূল বক্তব্য এই নির্বাসন এবং ঈপ্সিত স্বদেশ খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। পেঙ্গুইন বুকস কর্তৃক প্রকাশিত এই সুলভ সংস্করণে কামুর ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে এবং আমার যতদূর জানা আছে কামু এই ছ-টি গল্পই লিখেছেন। The Fall প্রথমে একটা ছোট গল্প হিসাবে লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন কামু। কিন্তু লেখার সময় তা হয়ে উঠল ছোট উপন্যাস। যাই হোক প্রকাশিত এই গল্পগুলিতে কামু একই সমস্যাকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম গল্পটির নাম The Adulterous Woman. কামুর কোনো গল্প বা উপন্যাসে মহিলা চরিত্র প্রধান ভূমিকা পায় নি। মহিলা চরিত্র এসেছে, নায়কের ওপর কিছুটা আলো ফেলেছে, চলে গেছে। তারা কোনো কিছুর নিয়ামক হয় নি। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি তার ব্যতিক্রম। জেনি এই গল্পের নায়িকা। তার স্বামী মার্সেল ব্যবসাদার। উত্তর আফ্রিকার আরবদের কাছে

সে মালপত্র বিক্রি করে। স্বামীর সঙ্গে জেনিও চলেছে উত্তর আফ্রিকায়। জেনি আসতে চায় নি। তবু এল। সে মার্সেলের কাছে প্রয়োজনীয় তাই। যে নিবিড় একাত্মীকরণ, যাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় প্রেম বলি, তা বোধহয় জেনি অনুভব করে নি। মার্সেলের কাছে জেনির দাম ফুরিয়ে যায় নি—শুধুমাত্র এই বোধটাই তাকে টেনে এনেছে। মরুভূমির মধ্যে জেনি দেখে স্বাধীন আরবদের, দেখে তাদের মুক্ত জীবন। তার মনে হয় এরাই মরু অঞ্চলের মুক্ত প্রাণের অধীশ্বর। জেনি ভাবে এই স্বাধীন জীবন, আদিম প্রাণপ্রবাহ, তার হতে পারত। এই তার নিজের জায়গা। এই তার রাজ্য। অথচ কি করে যে এই ধারণা পেয়ে বসল তা জেনি জানে না। শুধু আনন্দ আর কোমল বেদনায় ভরে এল জেনির চোখ। জেনি খুঁজে পেয়েছে তার স্বদেশ। কিন্তু এই স্বদেশের অংশ আর সে হতে পারে না। সে কিছুতেই ফিরে পাবে না যাযাবর আরবদের পশুসুলভ সুন্দর ও প্রাণপ্রাচুর্য ভরা জীবন-যাত্রা। এর পর থেকে জেনির অনুভব বেদনার্ত কবিতার মতো অদ্ঘাত ও গভীর। রাতে জেনি একা একা এসে দাঁড়াল বারান্দায়। দূরে দেখা যাচ্ছে যাযাবর আরবদের তাঁবু। বিবশিত হয়ে উঠল বিগতযৌবনা জেনির সর্বাঙ্গ। কোনো শব্দ নেই। বাতাস নেই। কেবল মাঝে মাঝে শীতের চাপে পাথরগুলি ভেঙে বালি হওয়ার অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছে। উন্মোচিত হচ্ছে জেনির সত্তা। জেনি যুক্ত হচ্ছে এই আকাশ মাটি নক্ষত্র ও মরুভূমির সঙ্গে। জেনি নিজেকে একটু একটু করে তুলে ধরছে রাত্রির দিকে। ভুলে যাচ্ছে প্রতিবেশ। ভুলে যাচ্ছে মানুষের জীবনের দুঃসহ ভার, জীবনের ক্লান্তি, বাঁচা ও মরার ভীষণ যন্ত্রণা। জেনি এতকাল ভয় পেয়ে ঘুরে ঘুরে মরেছে। তার সামনে কোনো লক্ষ্য ছিল না এতদিন। এইবার শেষ হলো জেনির ছুটে মরার পালা। জেনি শিকড় খুঁজে পেয়েছে।

জেনি যা দিতে পারে নি মার্সেলকে, যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাও ছিল না মার্সেলের, তাই-ই সে দিয়ে এল মরুভূমির উদার রাত্রিকে। নির্বাসিত জেনি আবিষ্কার করল তার হৃত সাম্রাজ্য। জেনি যুক্ত হলো একটা ঐক্যবোধের সঙ্গে: মিশে যেতে পারল, মিলিয়ে নিতে পারল নিজেকে। ব্যাপ্ত হতে পারল—যা তার উত্তরণ। জেনি বেঁচে গেল। জেনির এই অনুভব আর এক ধরনের যৌনতা বোধ। কিছুটা মরমীয়া; কিছুটা ফ্রয়েডীয়। কিন্তু তার সামগ্রিক ফল কবিতার মতো দুর্জ্ঞেয় অনিবার্যতা।

জেনির এই অনুভবের সঙ্গে লরেন্সের কিছু চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। লরেন্সের কাছেও বিচ্ছিন্নতা একটা সমস্যা হয়ে ছিল। আদিম ও অপাপবিদ্ধ যৌনতার ভিতর থেকে লরেন্স মুক্তি অনুভব করেছেন। এবং এই অনুভবকে প্রকাশ করার সময় কামুর মতো লরেন্সও নিয়েছেন কবিতার আশ্রয়। আদিমতা এবং আদিম জীবনের মুক্ত প্রকাশের প্রতি দেখা যায় দু'জনেরই আগ্রহ। সুন্দর 'এনিম্যালইজম' দুজনেরই মুক্তির প্রতীক। জেনির মতো লরেন্সের নায়িকাও মিশে যায় মাটির উত্তপ্ত আঁধারে, বীজের নিঃশব্দ বিকাশে, তারকার আলোর রহস্যে। তারা গলে হয় চিরকালের প্রাণের অন্ধকার প্রবাহ।

এই গল্প সংকলনে জেনির মতো ভাগ্যবান হলো Growing Stone-এর নায়ক একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। জেনির মতো সেও যুক্ত হতে পেরেছিল, জেনির মতো তারও ঘুচে গেল বিচ্ছিন্নতা বোধ।

ইওরোপে শুধু লজ্জা ও আক্রোশ। সেই ইওরোপ থেকে ব্রেজিলের শহরে চলে এসেছে ইঞ্জিনিয়ার দ্য এরাস্ট। কিন্তু এই নূতন পৃথিবীর আদিম জীবন-যাত্রার আদিমতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারল না এই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। একদিকে তাকে টানে এই আদিম জীবনযাত্রার ঐশ্বর্য। আদিবাসীদের প্রতি সে অনুভব করে আন্তরিক টান। তাদের সঙ্গে মিলে যাওয়ার একান্ত আগ্রহ অনুভব করে সে। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার হারাতে রাজী নয় ইওরোপীয় সংস্কৃতি থেকে পাওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আদিবাসীদের যূথবদ্ধ নাচ তাকে টানছে। এ সত্য। অন্যদিকে তার মার্জিত বুদ্ধির নিষেধকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। এও সত্য। ইঞ্জিনিয়ার বিরোধে বিক্ষত হয়। ইওরোপেও ফিরে যেতে পারে না সে। ইওরোপে আছে শুধু ঘৃণা আর আক্রোশ। ইওরোপকে শাসন করে বণিক আর পুলিশ। প্লেগের নায়কের মতো মানসিক অবস্থা ইঞ্জিয়ারের।

জাহাজে আসার সময় রাধুনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ইঞ্জিনিয়ারের। রাধুনী মানত করেছিল যে ভালোয় ভালোয় দেশে পৌছাতে পারলে একটা পাথর মাথায় করে নিয়ে যাবে গির্জায় একটা তিথিতে। তিথির আগের রাত্রে খুব নাচগান করেছিল রাধুনী। সকালে পাথরটা আর গির্জা অবধি বইতে পারে নি। মাঝপথে ফেলে দিল। ইঞ্জিনিয়ার পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজে পৌছে দিল গির্জায় নয়, বন্ধুর বাড়িতে। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার ধার্মিক বিশ্বাস অর্জন না করে পেতে চায় ধর্মীয় আনন্দ। আর পাথরটা বইতে হবে রাধুনীকে। এই পাথর

বইতে না পারার ব্যর্থতা বোধ থাকবে তার-ই। সিসিফাসের পাথরটা অন্যভাবে এসেছে এই গল্পে। ইতিমধ্যে যেটুকু ইঞ্জিনিয়ারের প্রাপ্য তা হল এই সেবা, দীন ভাবে এমপিরিকাল পথে অগ্রসর হওয়া। রাধুনীর বাড়ির লোক স্বীকার করে নিল ইঞ্জিনিয়ারকে এবং সেই হল তার নব জীবনের সূচনা।

Guest এই সংকলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প। আলজেরিয়া প্রবাসী ফরাসী স্কুলমাস্টার ডারু নিজেকে নির্বাসিত মনে করে। এখানে সেও অনুভব করে মানুষের রক্ত লোলুপতা। একদিন এক ধৃত আরবকে পুলিশের হেফাজতে রেখে আসার নির্দেশ পায় ডারু। প্রথমে সে এই করতে অস্বীকার করে। পরে তাকে করতেই হয়। ডারু যত্ন করে আপ্যায়ন করে ধৃত আরবটিকে। সে বুঝতে পারে না। পরের দিন সকালবেলা পুলিশ ফাঁড়ির পথে গিয়ে অন্য পথ নেয় এবং তার পালাবার সুযোগ করে দেয়। প্রথমে সে বুঝতে পারে না। তারপর সে বোঝে যে ডারু তাকে পালিয়ে যেতে বলছে। সে চলে যায়। কিছুদূরে গিয়ে সে কৃতজ্ঞতায় হাত নাড়ায়। ডারুর চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু ফিরে দেখে স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর কারা লিখে রেখে গেছে: তুমি আমাদের এক ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছ। এর দাম তোমাকে দিতে হবে। যে কৃতজ্ঞতা যে উত্তাপ নিয়ে ফিরে এল ডারু তা চকিতে নিভে গেল। যে সম্পর্ক যে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছিল ডারু তা শেষ হয়ে গেল। সেই বিস্তীর্ণ নির্জন উপত্যকায় ডারু নিজেকে খুব একা বোধ করতে লাগল। নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গতা বোধ করার সঙ্গে অবিরাম বরফ পড়ার যোগাযোগ আছে তা প্রতীকের স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জেনি এবং ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া এই গল্পের অন্য কোনো চরিত্র কোনো উত্তরণ খুঁজে পায় নি। তারা তাদের সাম্রাজ্য খুঁজেছে; কিন্তু পায় নি। তারা বেদনার্ত, নিঃসঙ্গ এবং নির্বাসিত রয়ে গেল।

রীতির দিক কামু বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন রীতি প্রয়োগ করেছেন! The Adulterous Womanকে যদি কাব্যিক রীতির প্রকাশ বলে ধরা যায় তবে The Silent Manকে বলতে হয় গল্পের বাস্তবমুখী ধ্রুপদী প্রকাশ এবং The Renegadeকে বলা যেতে পারে ফকনরীয় রীতির সার্থক প্রকাশ। রীতির বিষয়ে সদাজাগ্রত ছিলেন কামু। তাই তাঁর কথায় "...problems of style and composition never cease to preoccupy me."

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে মানুষের সম্পর্কহীনতা এবং সম্পর্ক স্থাপনের

সমস্যা, যা কামুর সমগ্র সাহিত্যের সমস্যা, তা এই কটি গল্পে বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত এবং কামুর অনুরাগী এ দেশীয় পাঠকদের কাছে এই সংকলন সাদরে গৃহীত হবে।

জ্যোতির্ময় বসু

জন্মের নায়ক। কৃষ্ণ ধর। প্রতিভা, কলি-৯। দাম তিন টাকা॥

"এ জন্মের নায়ক" কাব্যগ্রন্থকে কবি কৃষ্ণ ধর দুভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রথম ভাগের নাম "স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ", দ্বিতীয় ভাগের শীর্ষ নাম "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়"। "স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ"র কবিতাগুলি কবির স্মৃতিচারণা। এই স্মৃতিচারণায় কবির আকুতি কখনো প্রকাশ পেয়েছে প্রেমাস্পদের জন্য, কখন বা কবি অভিমান ভরে কিঞ্চিৎ ক্ষোভে মেনে নিয়েছেন, "আমাকে ডাকবে না তুমি। কোনোদিন আর ভুলেও ডাকবে না, জানি।" অর্থাৎ যে আবেগই প্রকাশ পেয়ে থাকুক না কেন প্রেমের জন্য, প্রেমিকার জন্য আকুলতা কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে বিরাজিত। কবি এ বিষয়ে সচেতন, তিনি জানেন

"এখানে আর ভালবাসা নেই
আছে তার স্মৃতিটুকু,
আগুনের মতো, ক্ষতের মতো, যা
আমাকে দিন রাত কাটছে।" (দুরন্ত চড়াই ও আমি)

তাই এমন নায়কের পক্ষে মৃত্যুচেতনা বাস্তব হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে "আমাকে ছলনা করো না তুমি", "সে আমাকে ভুলবে না বলেছিল ক্রন্দিত সময়ে"; "মনে পড়ে চঞ্চল রৌদ্রের কথা" প্রভৃতির মতো পংক্তি ভাষা ও উপমা পালটে প্রায় বার বার ঘুরে আসে, সেখানে কবির পক্ষে বলাই স্বাভাবিক যে,

"আমার যদি মৃত্যু হয়, তবে
জানবো আমি তোমাকে পেলাম শেষে,
এখন তুমি অনেক দূরে, নাগাল মিলবে না"

অথবা এমন পংক্তিই আমাদের হৃদয় হরণ করে যেখানে কবি নায়কের বিপদ ও ব্যথাকে অন্তহীন করে তোলেন। যেমন :

"আমি তো তোমাকে ডাকি, তুমি কবে ডাকবে আমাকে—
স্মৃতির অপর নাম মৃত্যু, দুঃখ শুধু আমাকেই ঢাকে।"

অথচ "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়..." পর্যায়ে কবি আশ্চর্যভাবে এই

বেদনা, হতাশা, স্মৃতিচারণার ব্যক্তিগত জীবন পেরিয়ে যুক্ত হয়েছেন বৃহত্তর জগতের সঙ্গে, মহত্তম সত্তার সঙ্গে। সেইজন্য কবির নায়ক ট্রাজেডীর অন্তহীন বিপদ পরিত্যাগ করে আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,

"আর তোমার ওই
লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে
সেই কালোমানিকের পিদিম জেলে
পৃথিবীকে আলো করো,
আফ্রিকা॥" (আমার আফ্রিকা)

এই পর্যায়ে তাই কবির নায়ক সমসাময়িক ঘটনায় বিচলিত হয়, এবং সেই ঘটনার আবর্ত থেকে স্বচ্ছ জীবনবোধ অনুসন্ধান করে। নায়ক জানে যে পৃথিবীর নানা বিষাদ ও দুঃখের মধ্যেও মানুষের আশা অন্তহীন, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত এবং মানুষ সেই সুখের জন্য উৎসুক। তাই "কন্যাকুমারিকায় একরাত্রি" কবিতায় জেলেদের ট্রাজেডি ও দুঃখের মধ্যে আমরা তিনজনের আশাবাদ উভয়ের বৈপরীত্যে এত উজ্জ্বল ও তীব্র হয়ে ওঠে। কবি কৃষ্ণ ধর এ রকম একটি কবিতা রচনা করেছেন, যা রসিক পাঠককে সহজেই অভিভূত ও মুগ্ধ করতে বাধ্য। "স্মৃতি ফলকে উৎকীর্ণ" অধ্যায়ের কবিতাবলীতে কবির নায়ক যন্ত্রণায় বিদ্ধ ও কাতর, সে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে মরছে, অথচ "সেই ফুলগুলি এখন কোথায়..." শীর্ষক কবিতাবলীতে কবির নায়ক সামাজিক পটভূমিকায় বৃহত্তর পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন বলেই সে জানে পথ কোথায় এবং সে জানে মানুষ যতই দ্বিধান্বিত ও কুণ্ঠাগ্রস্ত হোক না কেন, মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই কবি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন,

"আগে ছিল ওরা দুইজন
এখন গোটা শোভাযাত্রার দর্পণে
ওদের রোদে পোড়া মুখ দুটো
ভালোবাসায় জলছে,

এগুলো মানুষের জন্য॥" (রূপান্তর)

"এ জন্মের নায়ক" এই রূপান্তরেরই অভিব্যক্তি। এমন বলিষ্ঠ আশাবাদের সোচ্চার ঘোষণার আজ একান্ত প্রয়োজন, বিশেষত আধুনিক বাংলা কবিতায়।

এসো নীপবনে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক সোসাইটি। দাম চার টাকা।

দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আয়োজনে অথবা অবকাশ যাপনের অলস প্রয়োজনে যাঁরা উপন্যাস পাঠ করেন, তাঁদের কাছে "এসো নীপবনে" যথেষ্ট সম্মান পাবে না— একথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো। কারণ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দুরূহ ও জটিল সমস্যার অবতারণা করেছেন বর্তমান উপন্যাসে, যে সমস্যাটি সমসাময়িককালের আধুনিক মনের সমস্যা এবং যা অনুধাবন করা আলস্যে সম্ভব নয়। অবনী, প্রীতি এবং হেমন্ত—এই তিনজনকে কেন্দ্র করে এবং তিনজনের মানসিক অবস্থা প্রক্ষেপ করে লেখক সামগ্রিক সমস্যা ধরতে চেয়েছেন। বর্তমানে হতাশা ও ক্লান্তির স্বরূপ এবং সেই ক্লান্তি ও ফ্রাসটেশান ব্যক্তি-মনের কোন্ অবস্থায় উত্থিত হতে পারে, তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, "এসো নীপবনে" উপন্যাসের লেখক ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ ও সামাজিক জীবনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। রাত্রি, সকাল, সন্ধ্যা— এই তিন পর্বে ভাগ করে লেখক একে একে অবনী, প্রীতি ও হেমন্তর ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে উক্ত চরিত্রগুলির একটি অখণ্ড সত্তা নিরূপিত করেন, ফলে পঙ্গু অবনী দৈহিক সুস্থতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যে আত্মরতিতে মগ্ন হয় প্রীতি মানসিক ভাবে সেই আত্মরতিরই অংশীদার হয় শেষ পর্যন্ত। এবং অবশেষে অবনীর আকস্মিক আত্মহত্যার সংবাদ শুনে প্রথমদিকে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিলেও, শেষ রক্ষা করতে পারে না, তাই স্বামী বর্তমান অবস্থায় সে অবনীর মৃতদেহের উপর মাথা কুটতে দ্বিধা করে না। বস্তুত, স্বামীর একটি অন্তঃশীলা লুব্ধতাই (অবনীকে ঠিকমত হাতে না রাখতে পারলে সম্পত্তি থেকে অনাদি বঞ্চিত হবে এই ভয়ে) প্রীতিকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ অবনীর সেবায় নিয়োজিত করেছে, প্রীতি হয়তো অভ্যাসের বশে প্রথম প্রথম অবনীকে ঘৃণা করলেও এই কবি মানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। এই ভালোবাসার মূলে একটি প্রচণ্ড স্বার্থ কাজ করলেও অবশেষে ভালোবাসার স্বাভাবিক নিয়মেই পঙ্ক থেকে পঙ্কজই প্রস্ফুটিত হয়েছে, আমরা প্রীতির অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমের জন্য সচকিত হলেও স্বাভাবিকতার জন্য আকৃষ্ট হই। অন্যদিকে হেমন্ত বিবাহিত জীবনে অসুখী এবং দীর্ঘদিন নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে পারে না বলেই নীহারকে দেখে মুহূর্তেই প্রেম নিবেদন করতে কুণ্ঠিত নয়। হেমন্ত অবনীর বন্ধু, অথচ অবনীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা গভীর হলেও অবনীর পিতার ঋণই যেন হেমন্তকে অবনীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী করেছে।

হেমন্ত সিনিক, সে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে সর্বত্রই প্রায় স্বার্থের বীজ দেখতে পায়। সেজন্য অবনীর মৃত্যুর পর তার জীবনী লেখার ব্যাপারে, চীফ রিপোর্টার ও পত্রিকা অফিসের মালিকের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোথায় যেন পরার্থপরতা অপেক্ষা স্ব-স্বার্থরক্ষার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রীতির সম্পর্কে তার ধারণা কিছুটা ধোঁয়াটে। আবার প্রীতির ফ্রাশটেশানের মূলে (ফ্রাশটেশানই বলবো) কি গূঢ় কার্যকারণ অথবা প্রতিক্রিয়া কাজ করছে লেখক তা দেখাতে চেষ্টা করেও হেমন্তর ধারণা স্পষ্ট করতে পারে না। লেখক এখানে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন বলে বোধ হয়। অবনীর দ্বিধা দুর্বলতা, নিরাসক্তি, হতাশার তাৎপর্য তার দৈহিক পঙ্গুতায় বিচার্য হলেও, হেমন্ত এবং প্রীতির হতাশা ও ক্লান্তির কারণ যথেষ্ট গভীরতায় নিমগ্ন হতে পারে নি বলে আমার বিশ্বাস। প্রীতির সঙ্গে অবনীর, অনাদির সম্পর্ক অতি সুন্দররূপে চিত্রিত, অথচ প্রীতির কোন্ মানসিকতায় অথবা কখন কোন্ পর্যায়ে অবনীকে ভালোবাসল, এই ভালোবাসার উৎস কোন্ মূলে, লেখক তার ইঙ্গিত দিলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তেমনি হেমন্তর মিশ্রিত অনুভূতির উৎস-সম্পর্কে লেখক আরও স্পষ্ট ও সহজ ধারণা দিলে উপন্যাসটি অনিন্দ্য হয়ে উঠত।

শান্তিরঞ্জন একটি সুন্দর পদ্ধতি "এসো নীপবনে" প্রয়োগ করেছেন। এক একটি অনুষঙ্গে স্মৃতিচারণা করে, কখনো অতীত ঘটনাকে আগে কখনো বা বর্তমান ঘটনাকে পরে সাজিয়ে ঘটনার গতি দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন রেখেছেন। এ পদ্ধতিতে চেতনা-স্রোতে গা ভাসিয়ে যে প্রকটতা লক্ষ্য করা যেত, শান্তিবাবু তা অতি সংযমে ও সতর্কে পরিহার করেছেন। যার ফলে উপন্যাসটি প্রকরণের এক নতুন আস্বাদ দেয়। শান্তিবাবু উপন্যাসটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে ঠিক তিনটি পর্বের মেজাজ অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন, সেজন্য তিনজনের স্বগতোক্তিও মিশ্রিত আবেগে বিভিন্ন স্বরের জন্ম দিয়েছে এবং তিনজনের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জনপ্রিয়তার মোহে সস্তা রোমান্টিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নি বলে শান্তিরঞ্জন রসিক পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন এবং উপন্যাস যে একমাত্র গভীর ও মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাৎপর্যমণ্ডিত হয় একথা "এসো নীপবনে" প্রমাণ করেছে। সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও এজন্য শান্তিবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কুশল লাহিড়ী

চিত্র প্রদর্শনী : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানা।

গত ৮ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানার চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজানা উভয়েই স্বশিক্ষিত শিল্পী, এবং প্রকাশ্য প্রদর্শনী উভয়েরই এই প্রথম। প্রদর্শনীটিতে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঠারোখানি এবং মণি জানার তেইশখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রথম প্রদর্শনীতেই উভয়ে প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশেষত উভয়েরই নানা আঙ্গিক, ভঙ্গি ও শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৃষ্টিশীল বলেই প্রতীয়মান হল। প্রদর্শনীটি চলাকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা উচ্চকণ্ঠে শিল্পীদ্বয়কে প্রশংসা জানিয়েছেন।

শিল্পী হিসাবে এই প্রদর্শনী 'পরিচয়' পাঠকদের নিকটে পরিচয়ের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পরিচয় প্রদর্শিত করেছে। শিল্পী হিসাবে তাঁর genre অনেকাংশে প্রতীকী আবার 'ফরেষ্ট' প্রভৃতি চিত্র ইমপ্রেশনিষ্টিক। ডে ব্রেক প্রভৃতি চিত্রে তিনি যেমন অতি-আধুনিক শৈলী (যেমন সংবাদপত্র দেখা, এক টুকরো দৈনিক স্টেটসম্যানের টুকরো চিত্রে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া) ব্যবহার করেছেন, আবার সানওয়ারশিপার, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি চিত্রে প্রকাশমানতা ও প্রতীকতার সমন্বয় এনেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত চড়া রঙ ব্যবহার করতে ভালোবাসেন মনে হল। রঙের বৈপরীত্যে মাঝে মাঝে চিত্রের রসগ্রহণে বাধাও সৃষ্টি করে। কৃষ্ণলীলা, হরপার্বতী, নটরাজ প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল বিষয়বস্তু ছাড়াও, লাঠি চার্জ, থ্রি ডান্সার্স, হাঙ্গার, ডে ব্রেক প্রভৃতি আধুনিক বিষয়ও তাঁর চিত্রে লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, প্রকৃতি, স্মৃতি ও মিথলজি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি মূল বিষয়বস্তু। চিত্রের স্পন্দন ছন্দ ও বর্ণচ্ছটায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বশিক্ষিত অঙ্কণরীতিতে পারদর্শিতা অর্জন করবেন বলেই আমরা আশা রাখি।

মণি জানার চিত্রগুলি একেবারে অন্য মেজাজের। তিনি যেমন পোর্ট্রে´ট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি প্রতীকী চিত্রসহ নানাবিধ শৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ দেখিয়েছেন। সুধেন্দু উইথ সান, সুধেন্দু মল্লিক এবং সেল্ফ্ উইথ দি মুন তাঁর পোর্ট্রে´ট অঙ্কনের কৃতিত্বই অধিক স্পষ্ট করে দেখায়। তা ছাড়া আথার অব গুএরনিকা, শিশিরকুমার ইন মাইকেল'স রোল এবং মেলান্কলি ক্লাউন চিত্রে পিকাসো, শিশিরকুমার এবং চ্যাপলিনকে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন। তাঁর চিত্রগুলিতে সারল্য, রেখার দৃঢ়তা এবং নিবিড় একাকিত্ব লক্ষণীয়। তাঁর 'ল্যাসিভিয়াস' একেবারে অন্য মেজাজের চিত্র, এটিতেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

আমরা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণি জানার উত্তরোত্তর চিত্রে দক্ষতা কামনা করি। তাঁদের চিত্রপ্রদর্শনী সত্যই চমৎকার।

তরুণ সান্যাল


কষ্টদায়ক
সর্দি কাশির
দ্রুত আরামের
জন্য বি. আই. কফ
সিরাপ ব্যবহার করুন
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী